# মন মানে না

# মন মানে না

গৌরকিশোর ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ: ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রী
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিন্টার্স

বাঁধাই
ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এজেন্সি

দাম: তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

মন মানে না, শিশির এবং একটি প্রতিশোধের কাহিনী 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায়, আগামী 'উত্তরসূরী'তে, ম্যানেজার শারদীয় 'জনসেবকে' আর জবানবন্দী অন্ধকূপ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে পরিবেষণের জন্য ত্রিবেণী প্রকাশনকে ধন্যবাদ।

বরানগর
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৬৬

গৌরকিশোর ঘোষ

এই লেখকের

এই কলকাতায়

রূপদর্শীর নকশা

সার্কাস

নাচের পুতুল

কথায় কথায়

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

চেনা মুখ

রঙ্গ ব্যঙ্গ

মেঘনামতী

অন্নপূর্ণা

বিমল কর

প্রিয়বরেষু

# মন মানে না

সুনীলা চিঠি লিখছিল বাবাকে : 'বাবা, কলকাতা আর ভাল লাগছে না। মোটেই না। মন কেমন করে তোমার জন্যে। কান্না পায়।

কান্না পায়। লাইনটা যদি দেখে ফেলে সঙ্গীরা? শিপ্রা কি স্মৃতি কি সুরেখা? তা হলে আর টিকতে দেবে না হস্টেলে। খাবার ঘরে মুখরোচক চাটনি হিসেবে বেশ দিন কতক চলে যাবে সবার। ফোর্থ ইয়ারের মেয়ের বাবার কথা মনে পড়লে কান্না পায়, এই কথা জেনে যে আর সবার হাসি পায়। তা পাক হাসি। বয়ে গেছে ওর। ওর যদি কান্না পায়, তা ও কী করতে পারে? ওর মত বাবা ওদের যদি থাকত, কাঁদত কিনা ওরাও দেখা যেত। এই তো বিকেল হয়েছে। ইস্কুলের ছুটি হল। বাবা ফিরে এসেছেন বাড়িতে। পুসিটা পায়ে পায়ে লেগে ঘড়র ঘড়র করতে করতে ঘুরঘুর করছে। বাবা জামা খুললেন, কাপড় ছাড়লেন। চেয়ারটা টেনে বারান্দায় বসে পড়লেন। জগুদা কি বাড়িতে আছে ভেবেছ? কক্ষনো না। ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে বাবু আড্ডা দিচ্ছেন। এ সময়ে যে বাবার কাছে থাকবে, হাত পা ধোবার জল দেবে এগিয়ে, শরবত একটু করে দেবে তা নয়। বাড়ি থেকে বাবা বেরিয়ে যাবার পর বাবুও বেরুবেন আর ফেরবার নামটি নেই। সে থাকলে তবুও হত। আচ্ছা বাবা যদি হঠাৎ মরে যান! উঃ!

সুনীলা আর ভাবতে পারে না। অন্তহীন অন্ধকার দেখে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়, দেরাজ টেনে হাতের কাছে টাকা পয়সা যা পায় নিয়ে তরতর করে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাটা পার

হয়েই পোস্টাপিস। তক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম করে দেয় বাবাকে ঃ কেমন আছ। উৎকণ্ঠিত। তার করে জানাও।

বাকী পয়সা আর তারের রসিদটা নিয়ে সুনীলার খেয়াল হয় এটা পোস্টাপিস। ও বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিল। ঝোঁকের মাথায় এ কী করল? ছি ছি! বাবা কী ভাববেন? টেলিগ্রামটা যদি রাত্তিরে পৌঁছোয়। বাবা কি ভাববেন? ওঁর শরীর হয়তো খারাপ! সারারাত ঘুম হবে না, যতক্ষণ না ওকে টেলিগ্রাম করতে পারছেন। নিজের উপর ভয়ানক রাগ হল সুনীলার। খুব ইচ্ছে হল তারটা ফেরত নেবার। দরকার নেই বাবাকে অনর্থক মনোকষ্ট দিয়ে। বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। ছি-ছি!

কাউন্টারে এগিয়ে গেল। কেরানীটি একমনে কাজ করে চলেছে। কী ভাববে লোকটা তারটা ফেরত চাইলে। বেজায় লজ্জায় পড়ল বেচারা। লাল হয়ে উঠল মুখ চোখ। আহাম্মক ভাববে? তার আবার কেউ ফেরত নেয় নাকি? হয়তো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়েই থাকবে খানিকক্ষণ। কী যে মুশকিলে পড়ে গেছে সুনীলা। রাগ হল নিজের উপর। মরতে ইচ্ছে হল ওর। ফিরেই যাবে। একটা বোকামি তো করেই ফেলেছে। আর বোকামি করা কেন!

ফিরতে যাবে এমন সময় কেরানীটি মুখ তুলে চাইল।

"কী চাই বলুন?"

চমকে উঠল সুনীলা। যেন তার বোকামিটা ধরে ফেলেছে লোকটা। হয়তো অনেকক্ষণ থেকেই ধরেছে। কাজের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এতক্ষণ ধরে ওর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। আচ্ছা শয়তান তো লোকটা! সুনীলা ভারি বিরক্ত হল।

"বলুন কী চাই?"

এখন একটা কিছু তো বলা চাই। কিন্তু কী বলবে! ঠোঁট মুখ গলার স্বর সব যে আটকে গেছে। সুনীলা প্রাণপণ চেষ্টায় ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর অধিকার আনল।

"দেখুন যে তারটা করলাম একটু আগে—"

বাস্, আর কী বলবে? কথাগুলো ঢেলা পাকিয়ে ওর কণ্ঠস্বরকে আটকে দিল।

"হ্যাঁ, তা কী? সে তারটা—"

শোনবার জন্যে ঝুকিয়ে রইল কেরানীটা। সুনীলার ইচ্ছে হল ঠাস্ করে ওর লম্বাটে গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়। মনে মনে আবার হাসা হচ্ছে! পাজী কোথাকার! প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল। গম্ভীর হয়ে গেল।

"ও তারটা কখন পৌঁছবে বলতে পারেন?"

"তা কী করে বলব? বলা সম্ভব নয়।"

খুব মাতব্বরী চালে কেরানীটা জবাব দিল। সুনীলা একটা হাঁফ ছেড়ে ফিরল। পিছন থেকে কেরানীটার বকবকানি কানে গেল ওর।

"আমি তো আমি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলতে পারুক দেখি। হুঃ।"

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুনীলা দেখল, কেউ নেই। যাক। নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বড্ড হাঁফ ধরে গেছে ওর।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। এই সময় একটা সুন্দর হাওয়া দেয় কলকাতায়। সেটা যেন স্নেহস্পর্শ। সামনের জানলাটা খুললেই হাওয়াটা বেশ গায়ে লাগে। কিন্তু ওটা কি খোলবার জো আছে। রাস্তার ওপিঠের মেস-বাড়িটায় তা হলে সাড়া পড়ে যাবে না! আচ্ছা, এ লোকগুলো কী? ভিড় করে এসে দাঁড়াবে জানলায়। গান করবে। অশ্লীল ইঙ্গিত করবে। এত খারাপ হয় কী করে লোক? থাক্ যারা যেমন আছে। দরকার কি ওদের ঘাঁটিয়ে। জানলাটা বরঞ্চ বন্ধই থাক্। খড়খড়িগুলো দিয়ে হাওয়াটুকু আসে তাই ভাল।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল সুনীলা। চিঠিখানার কথা ভুলেই যাচ্ছিল, বেশ তো। বাবাকে ও না চিঠি লিখছিল! সেই ভাল। বরঞ্চ বাবাকে পরিষ্কার করে লিখেই দিক টেলিগ্রামের কথাটা। লিখে দিক : বাবা, তোমার জন্য মন বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছিল তাই

দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য হয়ে একটা তার করে দিয়েছি। তুমি মিছে চিন্তা করো না। আমি ভালই আছি। হ্যাঁ, এই বেশ হবে। কিন্তু চিঠিখানা কোথায় রাখল আবার? সেই ভাল, বাবা যদি আগেই চিঠিখানা পেয়ে যান তা হলে একটু হাসবেন না হয়, কিন্তু চিন্তার হাত থেকে রেহাই তো পাবেন। চিঠিখানা রাখল কোথায়? দেরাজে কি? টেলিগ্রামের আগে এখন চিঠিটা পৌঁছলে হয়। খুব পৌঁছবে। যা ব্যবস্থা আজকাল পোস্টাপিসের। কিন্তু চিঠিখানা? দেরাজের ভিতরে, টেবিলের উপর, চৌকির নীচে—কোথাও নেই। নিশ্চয় কেউ নিয়েছে। স্মৃতির কাজ। এতক্ষণ সবাইকে পড়ানো হয়ে গেছে তা হলে, হস্টেল-সুদ্ধ মেয়ে জেনে গেছে এতক্ষণে। হাসাহাসি করছে অভ্যাসমত গা টেপাটেপি করে। খুব রাগ হল ওর। ইচ্ছে হল এক্ষুনি হস্টেল ছেড়ে চলে যায়। খাবার সময়কার কথা মনে পড়তেই বিরক্ত হল বেজায়। আজ আর ওকে আস্ত রাখবে না কেউ। কেন ওর পিছনে সবাই অমন করে লাগে? কী ওর অপরাধ? বাবাকে নিবিড় করে ভালবাসা কী? ওরা কি জানে, বাবা ওর কাছে কী? আর কে আছে ওর বাবা ছাড়া? ও কি বাবাকে ছেড়ে কোথাও থেকেছে? বাবার কথা মনে পড়ল সুনীলার। বাবা যদি মরে যান হঠাৎ? না না, না না, ভগবান এমন করো না। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সুনীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

খুট করে আলো জ্বলল। সুনীলা মুখ তুলল না। স্মৃতি হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে।

"এ কী রে, অসময়ে শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ?"

জবাব নেই।

"এই সুনীলা, কী হয়েছে রে?"

সুনীলার মনে হল, স্মৃতি আর হাসি চেপে রাখতে পারছে না। বালিশের ভিতর মুখটাকে আরও জোরে চেপে রাখল।

"কী হয়েছে বল্‌না, এই, খারাপ খবর আছে না কি কিছু? বাবার চিঠি আসে নি বুঝি?"

ন্যাকামি হচ্ছে আবার! রাগে ফোঁস ফোঁস করছে সুনীলার সর্বাঙ্গ। ওর সঙ্গে জন্মের মত কথা বলবে না।

স্মৃতি মুশকিলে পড়ল। সুনীলার কী হল আবার। এই মেয়েটাকে নিয়ে সত্যিই আর পারা যাবে না। ফোর্থ ক্লাসে যার পড়া উচিত সে পড়ছে কিনা ফোর্থ ইয়ারে। কপালে হাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হল, ঠাণ্ডা, অসুখবিসুখ নয়।

"কী হয়েছে! এই, বল্ না।"

জোর করে মাথাটা যেই ঘুরিয়ে দিয়েছে অমনি স্মৃতি দেখল সুনীলার বালিশটা ভিজে চপ চপ করছে। মমতায় স্মৃতির স্বর খাদে নেমে এল, উৎকণ্ঠায় কেঁপে কেঁপে উঠল।

"কী হয়েছে বল্ না ভাই?"

রাগের চোটে সুনীলা বিছানার উপর উঠে বসল। ন্যাকামি বার করছি, দাঁড়াও। বালিশটা ছুঁড়ে স্মৃতিকে মারতেই চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল নীচে থেকে। সুনীলা হতভম্ব হয়ে গেল একেবারে। লজ্জিত হল খুব। স্মৃতিও কম বিস্মিত হয় নি।

"ক্ষেপে গেলি না কি?"

সুনীলা বলতে গেল. বোঝাতে গেল ব্যাপারটা, কিন্তু বৃথা। কথা জোগাল না। কোনও কিছু ভাবনা-চিন্তা না করেই চিঠিখানা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। লজ্জায় মাথা মুখ গরম হয়ে উঠল। চাইতে পারল না স্মৃতির দিকে। চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে শুয়ে বোকার মত হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

স্মৃতি একটুক্ষণ বসে রইল। তারপর উঠে নিজের টেবিলের কাছে গিয়ে আয়নার সামনে জামা কাপড় বদলাতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সুনীলাও ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সুনীলা ঘেমে উঠল। বোকার মত হাসিটা ওর মুখে লেগেই আছে। স্মৃতিও হাসল।

"কী রে, প্রেমে-টেমে পড়েছিস নাকি?"

"যাঃ! অসভ্য কোথাকার!"

ভ্রূ দুটো বেঁকে কপালের সীমা ছাড়াল প্রায়।

খাবার সময়টুকুতে এত গোলমাল করে মেয়েরা যে আর বলবার নয়।

কিসের যে এত কথা তা বোঝে না সুনীলা। রোজকার মত চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুর শশীর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এর উপর খবরদারি করা চাই।

"ও কি সুনীলাদি, এর মধ্যে হাত গোটালে কেন? ভাত কটা খেয়ে নাও। ঝোল এনে দিই না হয়। নাকি নেবে আলুপটলের ডালনা।"

যত লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে চায় সুনীলা, ততই ওকে নিয়ে অনাবশ্যক হৈ-চৈ করবে সবাই। গ্রহের যে কী যোগাযোগ বুঝে উঠতে পারে না। শশীর আবার স্নেহ উথলে উঠেছে ওর উপর। গার্জেন বনে গেছে একেবারে। হম্বিতম্বির আর অন্ত নেই। কি ভাবে ওকে সবাই কে জানে? কচি খুকীর মত দেখে না কী! সুনীলার ইচ্ছে করে গলা ছেড়ে চিৎকার করে জানিয়ে দেয় সবাইকে যে, গত মাঘে ওর বয়েস উনিশ বছর পার হয়েছে। নিজেকে চালাবার ক্ষমতা ওর ঢের আছে। অতএব ওর জন্য কাউকে মাথাব্যথা করতে হবে না।

"যাও না নিজের কাজে। আমার আর-কিছু লাগবে না।"

সুনীলা একেবারে ঝেঁজে উঠল। শশীও ছাড়বার পাত্র নয়।

"দেখ সুনীলাদি, ভাল হবে না বলছি। ওই রকম পাখির আহার করে করেই তো ফড়িংয়ের মত চেহারা হয়েছে। ভাল করে না খেলে বাবার কাছে লিখে দেব এক চিঠি।"

ওপাশ থেকে থার্ড-ইয়ারের কমুনিস্ট মেয়েটি ফোড়ন কাটল।

"পাখির আহার করলে চেহারা হবে ফড়িংয়ের মত। তা হলে সুনীলাদি, তুমি ভাই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বরদাদির মত আহার কর। তা হলেই ঐকিক নিয়ম অনুসারে তোমার চেহারা তোমার মতই থাকবে।"

হৈ-হৈ পড়ে গেল হাসিতে। এত দুঃখেও সুনীলা হেসে ফেলল। হঠাৎ কার একটা কথা শুনে ধক্ করে উঠল ওর বুক। আর ওঠা হল না। ঠিক বুঝতে পারল না কে কথাটা বলল।

"জানিস ভাই, ডক্টর বক্সী নাকি বিয়ে করবেন ?"

"কে, সত্যবান বক্সী ?

"যাঃ।"

"কক্ষনো না।"

"ওর না একটা ছেলে আছে !"

সুনীলার মুখ কালো হয়ে গেল। ততক্ষণে মুখ থেকে মুখে আলোচনা ফিরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

"কার সঙ্গে রে ?"

"দিন ঠিক হয়ে গেছে ?

"লভ্ ম্যারেজ না কি রে ?"

সুনীলা কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। কক্ষনো না, কক্ষনো না, ডক্টর বক্সী কিছুতেই আর বিয়ে করবেন না। উনি অত ছ্যাবলা নন। এ সব বাজে কথা। কোত্থেকে যে মেয়েরা এত বাজে খবর জোগাড় করে কে জানে ? তবু সুনীলার মনে কেমন একটা অকারণ বিষণ্নতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। মন খারাপ হয়ে গেল ওর। যে মেয়েটা এই খবরটা এনেছিল তার উপর চটে গেল। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করে এক সময় উঠে পড়ল।

পড়তে ও বসল ঠিকই। কিন্তু পড়া আর হল না। বই খুলে চুপচাপ চেয়ে রইল বটে কিন্তু অক্ষরগুলো কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যেন। স্মৃতি ঘরে ঢুকল। শিপ্রা আর সুরেখা পান চিবতে চিবতে এল। শিপ্রা বরফ-দেওয়া পানের গুণাগুণ সম্বন্ধে বক বক করে লেকচার দিয়ে চলল। সুরেখা হঠাৎ সুনীলার খুব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

"সত্যি ডক্টর বক্সীর বিয়ে নাকি রে ?"

সুনীলার বুক ধক্ করে লাফিয়ে উঠল আবার। চমকে গেল মনে মনে। কান মুখ চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটল। এতক্ষণ ধরে ওর মনে একটা রাগ নিরুপায় হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এখন একটা পথ পেয়ে সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরেখার উপর।

"আমি তার কী জানি ? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ে করবেন নাকি ডক্টর বক্সী ?

"চটছিস কেন ? তাই কি বলছি ? তোর তো মাস্টার—"

"ক্লাসে কোনদিন তিনি এই সাব্‌জেক্‌ট্‌ নিয়ে লেকচার দিয়েছেন বলে আমার স্মরণ নেই।"

আর এক মুহূর্ত দেরি করল না সুনীলা। ঠাস করে বইটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সুরেখা, স্মৃতি, শিপ্রা বোকা বনে গেল। আহা, বেচারা বোধহয় বাবার চিঠিপত্র পায় নি, তাই মেজাজ এমন তিরিক্ষে! তিনজনে ভাবল।

সে রাত্রে ঘুম ভাল হল না, সুনীলা এ-পাশ ও-পাশ করল, উঠে পড়ল, আলো জ্বালাল, বইয়ের পাতা খুলে বসল। বিরক্তি লাগল পড়তে। হিটার জ্বালিয়ে 'মাইলো' বানাল। কিন্তু খাবার উৎসাহ আর রইল না। মাইলোর গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে ধীরে ধীরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সব নিষুতি। রাস্তা নিথর। বাতিগুলো ঝিমুচ্ছে। রাস্তার উপরের মেসবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে মেঘগুলো সাঁতার কেটে চলছে। ঠাণ্ডা জলো বাতাস। তীব্র হর্ন দিয়ে একখানা গাড়ি চলে গেল। সুরযমল নাগরমলের বাড়ির কাছ থেকে একটা শিশু কেঁদে উঠল। শিপ্রা বিড়বিড় করে বকছে। সুনীলার ঘুম পেয়ে গেল। বিছানার উপর এসে গড়িয়ে পড়ল।

সুনীলা স্বপ্ন দেখল, ডক্টর সত্যবান বক্সীর বিয়ে হচ্ছে। ওদের ক্লাস-ঘরটাতে ছাঁদনাতলা বানানো হয়েছে। গোটা কলেজ-বাড়িটা ভেঙে পড়েছে সেই ঘরে, গিজগিজ করছে লোকজন। ভিড়ের চাপে চাপে সুনীলার দম বন্ধ হয়ে যাবার জো হয়েছে। ও বেরিয়ে আসতে চাইছে, পারছে না। অনেক কষ্টে ঠেলে ঠুলে যখন দরজার মুখে এসে পড়েছে তখন হঠাৎ ডক্টর বক্সীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ডক্টর বক্সীর পরনে চেলির জোড়, কপালে চন্দন, মাথায় টোপর। বেশ মানিয়েছে কিন্তু। আর হাতে রেজিস্টারখানা। চোখাচোখি হতেই সুনীলা চোখ নামিয়ে

নিল বটে, কিন্তু ওর মনে হল ও চলে যাচ্ছে দেখে ডক্টর বক্সী খুব চটে গেছেন। চোখ দেখে মনে হল পার্সেণ্টেজ কেটে নেবেন। কাটুকগে পার্সেণ্টেজ। ওতো আর পরীক্ষা দিচ্ছে না। ক্লাস বন্ধ হলেই চলে যাবে বাবার কাছে। পড়াশুনা আর হবে না ওর দ্বারা। বাইরে এসে বাঁচল। হাওয়া নিয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কোথায় সানাই বাজছে। আবার সানাইও আনা হয়েছে! শখ আছে। ডক্টর বক্সীর স্বর্গগত স্ত্রীর কথা মনে হতেই ওর খুব দুঃখ হল। কিন্তু সানাইটাতো ভালই বাজছে। ও হরি! ওদের কমন-রুমটাই নহবৎখানা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওদিক পা চালাতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সুনীলা।

"এই, ওঠ্! কত ঘুমুবি?"

চোখ চেয়ে সুনীলা দেখল রোদ উঠে গেছে। কাছাকাছি কোনও গ্রামোফোনের দোকান রেকর্ড বাজাচ্ছে সানাইয়ের। সুনীলার হাসি পেল। আচ্ছা স্বপ্ন দেখেছে তো? স্বপ্ন না হলেই বা কী? ডক্টর বক্সীর বিয়ে হলেই বা ওর কী। ডক্টর বক্সী বিয়ে করবেন না ছাতি! ডক্টর বক্সী খুবই 'সোবার' লোক।

কিন্তু তারপর থেকেই সুনীলার কী যেন হল। ডক্টর সত্যবান বক্সীর ক্লাসে ও আর সহজ হতে পারে না। তাঁর দিকে চাইতে গেলেই চোখ-মুখ-কান অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। কেউ যে ওর পরিবর্তন ধরতে পারে না সে ও স্বভাব-লাজুক বলে। ডক্টর সত্যবান বক্সীর সামনা-সামনি এলেই ওর গায়ের উত্তাপ বেড়ে ওঠে। তাই পারতপক্ষে এড়িয়েই চলে তাঁকে।

তবু দৈবকে কে এড়াবে? সেদিন ডক্টর বক্সী ক্লাসে ঢুকলেন। হাতে একখানা বই। সুনীলার বুক ছাঁত করে উঠল। ওই বইখানাই তো আজ ফেরত দিল লাইব্রেরিতে। ডক্টর বক্সী রোল্-কল শেষ করে রেজিস্টার বন্ধ করে রাখলেন। তারপর যেই না বইখানা খোলা আর একটা মোটা খাম খট করে টেবিলের উপর পড়ল। সুনীলার বুকে কে যেন একটা হাতুড়ি ছুঁড়ে মারল। চোখে

দেখল ঘন অন্ধকার। সর্ব্বনাশ! ডক্টর বক্সীও বিস্মিত হলেন। চিঠিখানা তুলে বেশ করে দেখলেন।

"চিঠিখানা তোমাদের কারও নাকি? নাম লেখা আছে সুকুমার রায় চৌধুরী।"

ক্লাসে একটা গুঞ্জন উঠল। সবাই একবাক্যে অস্বীকার করল। সুকুমার রায় চৌধুরী আবার কে?

ডক্টর বক্সী চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে পড়াতে লাগলেন সুনীলা সারাটা ঘণ্টা ধরে শুধু প্রার্থনা করে নিল, হে ভগবান, ডক্টর বক্সী যেন ভুল করে চিঠিখানা ফেলে রেখে যান। অন্যদিন পড়াতে না পড়াতেই ঘণ্টা শেষ হত বলে সুনীলা বিরক্ত হত। আজ বিরক্ত হল ঘণ্টাটা শেষ হতে অনাবশ্যক দেরি হচ্ছে বলে। যাক, ঘণ্টা শেষ হল। যদি চিঠিখানা রেখে যান ভুল করে। সুনীলা নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে রইল ডক্টর বক্সীর প্রতিটি নড়াচড়ার দিকে। কিন্তু এ কী, ডক্টর বক্সীর আজকে যাবার তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে পড়িয়েই চলেছেন।

সুনীলা আর থাকতে না পেরে পাশের মেয়েটার গায়ে এক ঠেলা দিল।

"ডক্টর বক্সীর দেখছি আজ যাবার তাড়া নেই। ব্যাপার কী?"

মেয়েটি একমনে বক্তৃতা শুনছিল। বাধা পেয়ে খুব বিরক্ত হল।

"কেন, উনি তো আজ দুটো পিরিয়ড নেবেন।"

হা ঈশ্বর! সুনীলার চোখে একেবারে অন্ধকার নেমে এল।

প্রফেসারদের ঘরের ভিড় আর কমে না। সুনীলা করিডরে অনেকক্ষণ পায়চারি করল। কোনরকমে বইখানা একবার হাতাতে পারলে ও বাঁচে। বইখানার মধ্যেই ডক্টর বক্সী চিঠিখানা রেখেছেন এটা ও দেখেছে। কী করে চাইবে বইখানা? স্যর্‌ বইটা একবারটি দেবেন? না-কি সটান চিঠিখানাই চেয়ে নেবে। চিঠিখানা চাইবার মুখ আছে নাকি? যদি বলে বসেন, ক্লাসে যখন বললুম চেয়ে নিলে

না কেন? ওর অবস্থায় পড়লে বুঝতেন কেন চেয়ে নেয় নি। একঘর লোকের সামনে দাঁড়াতে পারা যায় নাকি? ও বাবা! চোখের চাউনিতে আবার যা তাত। গলে যেত না মোমের মতন! ওর নিজেরও বলিহারি যাই বুদ্ধির। লাইব্রেরির বইয়ের মধ্যে কী জন্যে রাখতে গেল চিঠিখানা। সুনীলা বেজায় চটে গেল ডক্টর বক্সীর উপর। ওঁরই বা ওই বইখানা নেবার অত তাড়া কেন? আসলে ওকে মুশকিলে ফেলা আর কি। বুদ্ধিও তেমনি। বেয়ারাকে ডেকে পোস্টাপিসে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। পরের চিঠি রাখাই বা কী জন্য। কে জানে কী মতলব। এখন ভালয় ভালয় উদ্ধার করতে পারলে সুনীলা বেঁচে যায়।

মরীয়া হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সুনীলা। চোখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। কিছু বলবার ক্ষমতা কোথায় পালিয়ে গেছে। ওর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি লেগেছে ততক্ষণ। না, ঢুকে ঠিক কাজ করে নি। ডক্টর বক্সী উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে গল্প করছেন। সামনেই রয়েছে বইখানা। বইএর মধ্যে চিঠিখানা বাইরে মুখ ভাসিয়ে নির্বাক পড়ে আছে। কী নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছিল, ওকে দেখেই সব মুহূর্তে থেমে গেল।

"কী চাই?"

"ডক্টর বক্সীর সঙ্গে—"

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর বক্সী মুখ ফেরালেন।

"ও তুমি? কী ব্যাপার?"

কান মুখ জ্বলে যাচ্ছে গরমে, কোনরকমে সামলে রেখেছে বুকের টিপটিপানি।

"স্যর, আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় পার, এই নাও।"

ডক্টর বক্সী চিঠিখানা বের করে টেবিলের উপর রেখে ধীরে সুস্থে বই-খানা ওর হাতে দিলেন। সুনীলা হাসবে কি কাঁদবে কি ল্যাফ দিয়ে পড়বে কিছুই ঠিক করতে না পেরে বইখানা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কী হল তোমার ?"

সুনীলা বুঝতে পারছে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে।

প্রফেসাররা ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন সবাই। গলগল করে ঘামছে সুনীলা। অতিকষ্টে সমস্ত শক্তি একত্র করে ও কথাটাকে প্রায় ছুঁড়ে দিল।

"স্তর, চিঠিখানা চাই।"

"ও, চিঠিখানা চাও। তা বই চাইলে কেন ?"

ডক্টর বক্সী হেসে ফেললেন ওর অবস্থাটা দেখে।

"ভেবেছিলে চিঠিখানা তছরূপ করে ফেলব। তাই না ?"

ওপাশ থেকে এক হাড়গিলে ধরনের প্রফেসার রসিকতা করে উঠলেন। কায়দায় পেয়েছেন কিনা ওকে। তা এখন দিয়ে দিলেই হয় চিঠিখানা। ও চলে যেতে পারে।

"তুমি তো খুব অন্যমনস্ক। শুধু নামটাই লিখেছ। ঠিকানা লেখবারও ফুরসত পাও নি।"

এই রে! তাই বুঝি। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। নিজেকেই নিজে গাল দিতে লাগল কষে। যেমন মেয়ের গুণপনা তার তেমন শাস্তি হয়েছে।

"সুকুমার রায়চৌধুরী কে হন তোমার ?"

বোধ হয় অবস্থাটা সহজ করে আনবার ফিকিরেই এই সস্নেহ আলাপের ভূমিকা। সুনীলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দুঃসহ কষ্টের একটা কঠিন চাপ থেকে মুক্তি পেল খানিকটা।

"আমার বাবা।"

"ও, কোথায় থাকেন ?"

সুনীলা জবাব দিল।

"কী করেন তিনি ?"

"আমার বাবা হেডমাস্টার।"

"হেডমাস্টার। ফরিদপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন না ?"

সুনীলা ডক্টর বক্সীর রকম দেখে বিস্মিত হল। মাথা নেড়ে জবাব দিল। ডক্টর বক্সী খুব খুশি হয়ে গেলেন।

"আরে, তুমি সুকুমার বাবুর মেয়ে! আমি তো তাঁর ছাত্র। বাঃ বেশ তো।"

সুনীলা লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এল। খুশিতে ওর সর্ব শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। ডগমগ হয়ে ডুবে গেল। বাঃ রে, ডক্টর বক্সী বাবার ছাত্র! কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না সুনীলা। হঠাৎ আট আনার চানাচুর কিনে ফেলল। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল হস্টেলে।

দরজায় স্মৃতির সঙ্গে দেখা। বেরিয়ে যাচ্ছে সাজগোজ করে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওর দাদা। কী রকম দাদা কে জানে?

"সুনীলা, তোর চিঠি আছে। বিছানার উপর রেখে এসেছি।"

স্মৃতিকে দেখেই ও চিৎকার করে উঠেছিল প্রায় খুশিতে। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

"এই—"

স্মৃতির ভারি ভাল লাগল। ওর কাণ্ড দেখে। হাসি পেল।

"কী?"

কী? এর আর জবাব দেবে কি। আসলে একটু শব্দ করতে চাইছিল। এত আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না। পথ খুঁজছিল বেরিয়ে যাবার তাই ওকে ডাকল।

"কখন ফিরবি?"

ওর দাদার আর তর সইছে না।

"স্মৃতি শিগ্‌গির।"

"ফিরতে একটু দেরি হবে, বুঝলি।"

লাফাতে লাফাতে, দুটো তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে সুনীলা উপরে উঠল। বেজায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কাপড় জামা না ছেড়েই ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। ওর মুখে ঘাম আর চোখে খুশি উপচে পড়তে লাগল। শিপ্রা পড়ছিল। ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল।

"বাবার চিঠি পেয়েছিস্ বুঝি।"

শিপ্রাকে এসে জড়িয়ে ধরল। মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল কাল। শশীকে বকুনি দিয়েছিল। মাসীমাকে ডেকে রাগ ভাঙাল। শশীকে চানাচুর দিল। স্মৃতির জন্য সুরেখার জন্য আলাদা করে রেখে দিল। ও আর শিপ্রা বসে বসে খেল।

"সুরেখা আসে নি?"

"এসেছিল কখন। ওর সেই দাদার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।"

সুনীলা কি আর তা বোঝে নি। খুব হচ্ছে আজকাল দিন দিন, পরীক্ষা এসে গেছে খেয়াল নেই, কে জানে আবার পরীক্ষাটা পিছিয়ে পড়বে কি না।

"তা তুই যে বড় গেলি না তোর ল কলেজের দাদার সঙ্গে?"

শিপ্রা ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"বেশ তো পেকে উঠছ মেয়ে।"

"উঠব না! দস্তুর মত বয়স বাড়ছে যে।"

তারপর কী হাসি দু জনের।

শিপ্রা ভাবল বেশ আছে মেয়েটা। আজকে বাবার চিঠি পেয়েছে কি না, খুশিতে ফেটে পড়ছে তাই।

সুনীলা আর কী করবে ভেবে না পেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। উপুড় হয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে খুশিতে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ডক্টর বক্সী লোকটা সত্যি খুব ভাল। খু-উ-ব ভাল।

সভাতে যাওয়াটা প্রায়ই বাতিকেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুনীলার। কোথাও সভার ঘোষণা দেখলেই উসখুস করতে থাকত। গিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বক্তৃতা শোনা অথবা বক্তার বিভিন্ন ভঙ্গি লক্ষ্য করা কোনটায় তার আগ্রহ বলা অবশ্য কঠিন। ওর জন্যে অন্য মেয়েদের হত মুশকিল। তারা অত-শত মিটিং-ফিটিংএর ধার ধারে না। মিটিংএ যোগ দিয়ে কী যে মোক্ষ লাভ হয় এটা ওদের মাথায় ঢোকে না। কিন্তু চাক আর নাই চাক, ইচ্ছে থাক আর নাই থাক

ওদের কাউকে না কাউকে যেতেই হত সুনীলার সঙ্গে। ধরে পাকড়ে নিয়ে যেতই।

সেদিনও কী একটা মিটিং ছিল। ওদের প্র[illegible] অনেকে বক্তা। সে কথা বুঝিয়ে তর্ক করে, মিনতি করে যখন শিপ্রা আর সুরেখাকে রাজী করাল তখন সভা আরম্ভের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয় হয় আর কি!

হলের দরজায় এসে অবস্থা দেখে মনে হল এখনও আরম্ভ হয় নি। কিন্তু লোকজনই বা এত কম কেন? এটা কোন বিশেষ সভা না সাধারণ? শিপ্রার কেমন যেন খটকা লাগল।

"কি রে, সভার লোকজন কোথায়? ছুটে তো এলি, ভিতরে যাবার অনুমতি আছে কি না জানিস্ তো?"

সুনীলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সেটা তো ভাল করে লক্ষ্য করে নি, সুরেখা গেল চটে।

"তোকে নিয়ে মহা মুশকিল। ভাল করে জানা শোনা নেই, হুট্ করে এসে পড়লি। নে এখন ফিরে চল।"

সুরেখার রাগ দেখে বোকার মত হাসতে লাগল সুনীলা। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওরা জটলা পাকাচ্ছিল। হঠাৎ সুনীলার সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত বেড়ে গেল। ডক্টর বক্সী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। সুনীলা, শিপ্রা সুরেখাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফিস্ ফিস্ করে শিপ্রাব সঙ্গে পরামর্শ করল।

"এই যে, তোমরা কি মনে করে?"

"স্যর", শিপ্রা এগিয়ে এল, "মিটিং শুনতে কি কার্ড লাগবে?"

"হ্যাঁ তা তো লাগবেই। তোমরা কি শুনতে চাও?"

ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"তা বেশ ঢুকে পড়। এটা তো একটা সিরিজ শুরু হল। সবগুলো শোনবার ইচ্ছে হলে কার্ড করিয়ে নিও।"

সুরেখা খপ্ করে বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল। এমন অসভ্য মেয়েটা! সুনীলার ইচ্ছে হল একটা ধমক কষে দেয়।

"স্যর, টিকিটের কি দাম লাগবে ?"

ডক্টর বক্সী একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হাসলেন।

"ঠিক জানিনে। লাগতেও পারে। ওদের জিজ্ঞাসা করো।"

কয়েকটা ছেলে বসেছিল একপাশে। ওদের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

"কী, তোমার বাবা ভাল আছেন ?"

আচমকা এই প্রশ্নে সুনীলা চমকে উঠল। লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। কোনরকমে কথাগুলোকে গুছিয়ে ফেলল।

"ভালই আছেন।"

তারপরই মনে হল ঠিক যেন বলা হল না। ওর ততক্ষণে বুক দুরু দুরু করতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসতে পারলে বাঁচে।

ঘরে ঢুকে যে মেয়েটির পাশে বসল সুনীলা, সে ওর পরিচিতা, লতিকা মুখোপাধ্যায়। ওব থেকে বছর কয়েকের সিনিয়র। কোন এক-মেয়ে ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস্। লতিকাদির চেহারাটা খুবই সুন্দর ছিল আগে, সুনীলা ভাবল, ক বছর মাস্টারী কবে কেমন যেন একটা রুক্ষতা এসে গেছে। সুনীলাকে দেখে লতিকাদি মৃদু হাসলেন। ভারী সুন্দর দাঁত কটি কিন্তু।

"এই যে তুমি এসেছ'?"

লতিকাদি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন। সুনীলাও হেসে ফেলল।

"কেন আপনিও তো এসেছেন দেখছি।"

"হ্যাঁ, আমি এই ক্লাবের মেম্বার কিনা। মিটিং-টিটিং থাকলে মাঝে মাঝে আসি।"

"এটা ক্লাবের মিটিং। কী ক্লাব ?"

সুনীলা [illegible]রে ধীরে ভয় ভয় কবে প্রশ্ন করল। [illegible]টিয়ে জবাব আদায় ক[illegible]ল। প্রোগ্রেসিভ্ স্কুল অব্ পলিটিক্[illegible] কালচার। কয়েক[illegible] [illegible]গতিবাদী ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপকদের আড্ডা। [illegible]লেক্চার সিরিজ [illegible]। লাইব্রেরি আছে নৈশ পাঠশালা আ[illegible] প্রবীণ

অধ্যাপক অকিঞ্চন মজুমদারই গড়ে তুলেছেন এটাকে। ধীরে ধীরে জড়ো করেছেন সত্যবান বক্সীকে, প্রতুল মুখজ্জেকে। আজকের বক্তব্য বিষয় হল মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা।

বক্তৃতা শুরু হল। সুন্দর বললেন অধ্যাপক মজুমদার। তারপর উঠলেন ডক্টর সত্যবান বক্সী। কী যে অদ্ভুত বলেন! সুনীলার এত ভাল লাগে যে বলবার নয়। তন্ময় হয়ে গেল সুনীলা। উৎপাদন বণ্টনের মারপ্যাঁচের জটিল গ্রন্থিসকল খুলে খুলে যেতে লাগল ডক্টর বক্সীর বক্তৃতা প্রসাদে। তবু শিপ্রা আর সুরেখা শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল। ওকে ঠেলা মেরে ওরা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সুনীলার যেন ঘোর কেটে গেল। ও উঠতে যাবে, হঠাৎ চোখ পড়ল ডক্টর বক্সীর দিকে। পুরু পরকলা থাকলেও চোখ দুটোর লক্ষ্য হদিস করতে সুনীলার একটুও দেরি হল না। সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গেল ওর। ওঠা তো অসম্ভব, নড়ে বসতে পারে কিনা সন্দেহ। নিরুপায় দৃষ্টি একবার ফেলল পাশের দরজার দিকে। সুরেখা আর শিপ্রা ইশারা করছে বেরিয়ে আসবার। কিন্তু সাধ্য কি ওর, শক্তি কোথায় বেরিয়ে যাবার। বিরক্ত হয়ে ওরা দুজনে চলে গেল।

বক্তৃতা যখন শেষ হল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আটটায় হস্টেলে না ফিরলে মুশকিল। পাশে লক্ষ্য করে দেখে, লতিকাদিও কখন চলে গেছেন। ও-ই একমাত্র মেয়ে যে এখনও বসে আছে। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসে দেখে বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। সেরেছে, এ তো থামবে না শিগগির। কী হবে? আটটার মধ্যে হস্টেলে না ফিরলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে [illegible]য়ত দিতে প্রাণান্ত হবে। কেন চলে গেল না সুরেখা[illegible]? ঘন ঘন হাত ঘড়িতে সময় দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দা[illegible] মুণ্ডুপাত করতে লাগল বৃষ্টির।

"এই [illegible]ক পড়লে বুঝি?"

সুনী[illegible]রিয়ে দেখল ডক্টর বক্সী আর অধ্যাপক [illegible]জে।

"খুব [illegible]নোযোগ দিয়ে শুনছিলে দেখলাম। এসব [illegible]মার খুব ভা[illegible]গে?"

ডক্টর বক্সী সস্নেহে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। সুনীলা মুখ নীচু করে থাকল। অধ্যাপক মুখার্জী বৃষ্টির বহর দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

"ব্যাপার সুবিধে নয় বক্সী, সহজে ছাড়বে বলে বোধ হচ্ছে না। এদিকে পৌনে আট বাজল। ট্যাক্সিই নিতে হল। নইলে পৌঁছুতে পারা যাবে না ঠিক সময়ে।"

"তবে ডাকুন তাই।"

ট্যাক্সি এল। অধ্যাপক মুখুজ্জে উঠলেন। ডক্টর বক্সী উঠতে যাবেন, সুনীলাকে ডাক দিলেন।

"উঠে পড়। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।"

সুনীলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ডক্টর বক্সীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওর মাথা নুয়ে পড়ল। বাক্যব্যয় না করে ভেতরে ঢুকে গেল। ডক্‌টর বক্সী সস্নেহ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। কতটুকু মেয়েরা আজকাল কলেজ টপকাতে শুরু করেছে, অ্যাঁ। মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন ডক্টর বক্সী। ভারী লাজুক আর শান্ত আর একাগ্র। কেমন মনোযোগ দিয়ে ওঁর বক্তৃতা শুনছিল। ক্লাসেও সব প্রথম বসে মেয়েটি। তাঁরই মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে।

"আচ্ছা, মাস্টার মশাইয়ের সেই পানের কৌটোটা এখনও আছে? সেই জার্মান সিলভারের বই-মার্কা কৌটো?"

সুনীলার চোখ চকচক করে ওঠে খুশিতে। ভারি মজা লাগে ওর। বাবার কথা হুবহু মনে আছে ডক্টর বক্সীর। উৎসাহের চোটে মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে।

"হুঁ। আচ্ছা আপনাদের এই স্কুল অব পলিটিক্‌সের অফিসটা কোথায়?"

বলেই লজ্জা পেয়ে গেল সুনীলা। এতটা উৎসাহ প্রকাশ করা ঠিক হয় নি। কী মনে করলেন ডক্টর বক্সী?

"স্কুল অব্‌ পলিটিকস্‌টা যে আমাদের তা তুমি কি করে জানলে?"

এমনিতেই লজ্জায় পড়েছিল। ডক্টর বক্সীর এই প্রশ্নে মাথা একেবারে নুয়ে গেল। হস্টেলের দরজায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। ডক্টর বক্সী দরজাটা খুলে দিয়ে সুনীলাকে নামতে সাহায্য করলেন।

"আমাদের অফিস মীর্জাপুরে। মিত্র ইনস্টিটিউশনের পাশের বাড়িটার তেতলায়। ৬টার পর এস যে কোনদিন। কেমন ?"

নেমে বাঁচল সুনীলা। কোন রকমে সায় দিয়ে মাথা নেড়ে সিঁড়িটা টপকে ঢুকে হাঁফ ছাড়ল। বয়ে গেছে ওর যেতে! বাবা, এমনিতেই বলে ওর ধাত ছেড়ে যাবার জোগাড় হয়। ডক্টর বক্সী অদ্ভুত লোক কিন্তু। ছটার পর সব জমা হন আর কি ?

যাবে না যাবে না করেও শেষ পর্যন্ত গেল সুনীলা। যেতে হল তাকে। কিসের আকর্ষণ যে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিল, তা বুঝে ওঠা সম্ভব হল না ওর। ওঁদের সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। প্রৌঢ় অধ্যাপক অকিঞ্চন মজুমদারকে ওর বড় ভাল লেগে গেল। লাইব্রেরিটা দেখল। পাঠচক্রে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত নিয়মিত সভ্য হয়ে গেল। যে নৈশ বিদ্যালয়টা ছিল সেটা ভাল করে চলছিল না। যে ছেলে কটির উপর ভার ছিল তারা বড় ফাঁকিবাজ। বেশি কথা বলে, কাজের বেলায় নমো নমো। ছেলেমাত্রেই ফাঁকিবাজ, জ্যাঠা ফাজিল। সুনীলা ভাবল, এখানে যে ছেলে কটা আসে তাদের বেশির ভাগ তো বটেই। পড়াশোনা করার চাইতে, বক্তৃতা আলোচনার চাইতে, মেয়েদের দিকে নজর দেওয়াতেই বেশি তৎপর। ছেলেরাই এমনি। কেমন একটু হ্যাংলা। তাই কী ? সব ছেলেরাই এমন হয় কী ? সব পুরুষই কি এই রকম ? অকিঞ্চন বাবু ? কক্ষনো না। এমন ভাল লোক ও জীবনে দেখে নি। আর—আর—বক্সী ? না না থাউকো ভাবে কোন ধারণা করা উচিত নয় কারও উপর। মানুষের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা যায় না।

অকিঞ্চন বাবু বলছিলেন।

"ওরা স্কুলটা ঠিক চালাতে পারছে না। ওদের দিয়ে হবে না। ছেলেরা দরদ দিয়ে পড়ায়ও না, পড়াতে পারেও না। ওদের

হাত থেকে কাজের ভারটা যদি তোমরা তুলে নাও তাহলে ভাল হয়।"

কাদের কথা বলছেন অকিঞ্চন বাবু? তোমরা মানে? আমরা! আমাদের বলছেন স্কুলের ভার নিতে। সুনীলার প্রথম চোটে বিশ্বাসই হল না। পরে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। শেষে হস্টেলে ফিরল এক নিদারুণ উন্মাদনা নিয়ে।

"তোমার বাবা একজন আদর্শ শিক্ষক। ভালই হল বাবার বৃত্তিতে হাত পাকাতে শুরু করলে।"

ফেরবার মুখে ডক্টর বক্সীর মন্তব্যটা ঘুরে ফিরে ওর কানের পর্দায় ঘুরপাক খেতে লাগল। বাবা, অকিঞ্চনবাবু, ডক্টর বক্সী সব এক ধাঁচের লোক।

ডক্টর বক্সী সম্পর্কে নানারকম খবর পেয়ে গেল সুনীলা নানাজনের কাছ থেকে। সুরেখা যে খবরটা দিল তাতে সুনীলা এমন আঘাত পেল যে ওর মনে হল এক্ষুনি দম আটকে যাবে। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে রাখল। কী করে যে রাখল সেই জানে। সুরেখা বেরিয়ে যেতেই বিছানার উপরে ও ভেঙে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ডক্টর বক্সীর বাঁ হাত নুলো। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় কব্জিটিকে বাদ দিতে হয়েছে। ডক্টর বক্সী ওঁরই এক সহপাঠিনীকে ভাল বাসতেন। সবাই জানত ওঁদের বিয়ে হবে। কিন্তু সেই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল না ওঁকে। কারণ কী, না ডক্টর বক্সী নুলো। এত নিষ্ঠুর কী করে হয় মেয়েরা? ছ্যাবলা, খেলো, মেয়েরা খুবই ছ্যাবলা। সুনীলা সমস্ত মেয়ের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন ডক্টর বক্সী। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন নিশ্চয়। ডক্টর বক্সীর সেই দুঃখ এসে বাজতে লাগল সুনীলার বুকে। কেঁদে কেঁদে বালিশটা ভিজিয়ে ফেলল সুনীলা। পরে অবশ্য ভালই বিয়ে হয়েছিল ওঁর। গুণী মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। সুখে কেটেছিল দুটো বছর। আর তারপর তিনমাসের বাচ্চাটাকে রেখে মারা গেলেন মিনতি বক্সী। ডক্টর বক্সী কত কষ্ট করেই না বাঁচিয়ে তুললেন

বাচ্চাটাকে। এখন তো বছর পাঁচেক বয়স হল তার। কোন এক মিশনারী স্কুলে পড়ে। ভারি সুন্দর দেখতে নাকি ছেলেটাকে। সুনীলার কান্না থামল। ওর খুব ভাল লাগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। এত সুন্দর!

ইস্কুলটা সুনীলার কাছে একটা নূতন জগত। সাত আট বছরের ছেলেমেয়েগুলো ওর সামনে কলকল কলকল করে। ওর দেখতে ভারী ভাল লাগে। এক একটা এক এক রকম। কী দুষ্টু! বিচ্ছু শয়তান সব। কত রকমের পাকা পাকা কথা। কত রকম বুড়োমিপনা। অশ্লীল কথা অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করে যায় ওরা। যেমন মন অপরিষ্কার তেমনি ওদের শরীর। হলদে পোকা ধরা দাঁত, উকুনভর্তি শণের মত চুল। খোস পাঁচড়ায় থকথকে গা। প্রথম প্রথম সুনীলা সহ্য করতে পারত না। গা পাক দিত ওর। কিন্তু ওর কেমন ঝোঁক চেপে গিয়েছিল এদের ভাল করবার। সে পথ সহজ নয়। অধিকাংশই গরিব নিম্নমধ্যবিত্ত আর নয়তো দিনমজুরদের ছেলেমেয়ে। পেট পুরে খেতে পায় না সব দিন। খেলতে পায় না প্রাণখুলে। তা হোক, তবুও ওর হাতে যতটা আছে ও করবে।

আর করেও ফেলল অনেকটা। অবাক হয়ে গেলেন অধ্যাপকরা। খুশি হলেন অকিঞ্চন বাবু, সত্যবান বক্সী। ওর ক্লাসে আর হৈ চৈ হয় না। পরিচ্ছন্নতাবোধ জেগেছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। পড়াশুনা নিয়মিত হয়েছে। ওর মেহনতের ফল দেখা দিয়েছে। বড় কম মেহনত করতে হয় নি। প্রথম প্রথম মনে হত দুঃসাধ্য কাজ। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, নালিশ, মারামারি, চ্যাঁ ভ্যাঁ, একেবারে পাগল করে তুলত ওকে। অকিঞ্চনবাবু বলে দিয়েছেন শৃঙ্খলা আনা চাই সর্বাগ্রে। দরকার হলে পিটুনি দেবে। কিন্তু সুনীলা এই সব বন্যদের বশে আনল অন্য পথে। অকিঞ্চনবাবুরা পুরুষ মানুষ। পিটুনির ক্ষমতার কথাটাই জানতেন। ও দেখাল স্নেহের শাসন তার চাইতেও জোরাল। অকিঞ্চন বাবু ওর প্রতি স্নেহে গদগদ হয়ে উঠলেন। একদিন যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল ও হঠাৎ শুনতে পেল অকিঞ্চন বাবুর গলা।

"বুঝলে বক্সী মেয়েটা জাদু জানে।"

পড়াশুনা শুরু করবার আগেই সুনীলার কাজ হচ্ছে সমস্ত ক্লাসটা ঘুরে ঘুরে দেখা। কে দাঁত মাজে নি, কে স্নান করে নি, কার চুলে চিরুনি পড়ে নি এই সব তদারক করা ওর সব প্রথম কাজ। সেদিনও ঘুরে ঘুরে দেখছিল, অনেকদিন পরে গোবিন্দকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। ইস্কুলের মধ্যে সব চেয়ে ছোট বয়স কিন্তু খুব মেধা। খুবই চোখা ছেলেটি। রোগা তামাটে রঙ। ভারী মুখখানায় এই বয়সেও বেশ গাম্ভীর্যের ছাপ। ফলে একটু বিষণ্ণ দেখায় ওকে। আর সব চাইতে শান্ত। ওর চোখ দুটোতে অবাক হয়ে গেছে সব সময়ে এমনি একটা ভাব মাখানো। মধ্যে চার মাস ইস্কুলে আসে নি। ওর বোন কমলা ক্লাস টুতে পড়ে। তার মুখেই শুনেছিল ওর টাইফয়েড হয়েছিল। আরো রোগাটে হয়েছে দেখতে। মুখখানা শুকিয়ে আসবার ফলে চোখদুটো আরও বড় দেখাচ্ছে। কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সস্নেহে।

"কী রে ভাল হয়ে গিয়েছিস তো?"

গোবিন্দের চোখ ছল ছল করে উঠল। জবাব দিল না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর হয়ে জবাব দিতে কমলাই এগিয়ে এল। সুনীলার কাছে মুখটা এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"দিদি ওকে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না খবরদার। ও তাহলে কেঁদে ফেলবে। ওর বাঁ হাতটা জন্মের মত খারাপ হয়ে গেছে। সান্নিপাতিক হয়েছিল কিনা, হাতখানা নিয়ে গেছে।"

সুনীলা লক্ষ্য করে দেখল তাই তো। গোবিন্দের বাঁ হাতখানা শুকিয়ে গেছে। ঝুল্‌ ঝুল্‌ করে দুলছে। সুনীলার দেহে কে যেন হাজার খানেক ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। খুবই দুঃখ পেল ও। মনে মনে বলল, আহা বেচারা। মনটা মমতায় নরম হয়ে এল ওর।

ও পাশ থেকে গোপাল জিজ্ঞাসা করল,

"ওর কী হবে দিদি। ও বুঝি নুলো হয়ে থাকবে?"

ছপাৎ করে কে যেন চাবুক মারলে সুনীলাকে।

অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "গোপাল! ছিঃ!"

আর বলতে পারল না। আর খেয়াল রইল না। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত অশ্রু চোখের বাইরে উপছে পড়তে লাগল। গোবিন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুনীলা কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। সুনীলাকে কাঁদতে দেখে বিস্ময়ে ভয়ে দমটাকে আটকে সবাই বসে রইল।

ডক্টর বক্সী পড়ছিলেন লাইব্রেরিতে। আলমারির ফাঁক দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অবাক হলেন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কী হয়েছে?"

কেউ জবাব দিলে না।

"ব্যাপারটা কী?"

কমলা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল।

"আমার ভাই গোবিন্দর বাঁ হাত খারাপ হয়ে গেছে অসুখে। গোপাল ওকে নুলো বলল, তাই দিদি কাঁদছে।"

ডক্টর বক্সী চমকে সুনীলার দিকে চাইলেন। কোটের ভিতর বাঁ হাতখানা ওঁর নড়ে উঠল একবার। সুনীলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। চোখ মুছে ফেলেছে আঁচল দিয়ে। ওর সব অপ্রস্তুতি ডক্টর বক্সীরই সামনে। লাজুকভাবে হাসল কমলার দিকে চেয়ে।

"থাম, জ্যাঠা মেয়ে কোথাকার। বস, আর সর্দারী করতে হবে না।"

সুনীলা কপট-ক্রোধে ধমকে দিল কমলাকে। ডক্টর বক্সী একটু বিচিত্র হেসে ফিরে গেলেন।

নিচে নামতেই দেখা হয়ে গেল ডক্টর বক্সীর সঙ্গে। সুনীলার মনে হল উনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন হয়তো। ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললেন ডক্টর বক্সী। সুনীলাও হাসল।

"তোমার তো বড় কোমল মন। কে কাকে নুলো বলেছে আর তুমি কাঁদতে লাগলে।"

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। সুনীলা একটু হাসল। জবাব দিল না।

"ভাল কথা, তুমি নাকি গল্প লেখ?"

এইবারে চমকে উঠল সুনীলা। যেন একটা মহা গোপন অপরাধ ধরা পড়ে গেছে।

"আপনাকে কে বললে?"

"যেই বলুক, ঠিক বলেছে কি না?"

"কে বলেছে না জানলে কী করে বলি ঠিক বলেছে কি ভুল বলেছে।"

নিজের ক্ষমতায় নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সুনীলা। শুধু ঠিকমত বলছিল যে তা তো নয়, ঘুরিয়ে প্রশ্নও করছিল। কদিন আগেও কি সুনীলা জানত ওর মধ্যে এত সাহস আছে।

"যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে। কারণ, আর যেগুলো বলেছে সেগুলো তো ঠিক হয়েছে।"

"কী, কী বলেছে আর? কে বলবে আমার সম্বন্ধে? বাঃ রে।"

"তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? যা বলেছে ভালই বলেছে।"

সুনীলার তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল সব। কে এমন আছে ওর কথা বলতে যাবে ডক্টর বক্সীর কাছে। শিপ্রা? সুরেখা? স্মৃতি? আর বলেছেই বা কী? বলবেই বা কী? ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে আসতে লাগল, মহা বিব্রত হয়ে পড়ল।

"কী কী বলেছে বলুন তো?"

"বিশেষ আর কি? বাবা-অন্ত প্রাণ তোমার। ভাল মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। ফুলের বাতিক আছে। প্রত্যেকদিন রজনীগন্ধার ঝাড় না হলে মন খারাপ হয়ে যায়। গল্প-টল্প লিখে থাক পত্র-পত্রিকায়।"

ডক্টর বক্সী মিটিমিটি হাসতে থাকেন। সর্বনাশ, এত খবর পেয়ে গেছেন ডক্টর বক্সী! বড় নার্ভাস হয়ে পড়ল সুনীলা। ঘামতে শুরু করে দিল।

"স্বনামে লেখ না ছদ্মনামে?"

সুনীলা কোন জবাব দিল না। ভাবছিল, কে, কে আছেন তাদের হস্টেলে যিনি এই সব কর্ম করেন?

"কে বলেছে আপনাকে এই সব কথা, শুনি?"

সুনীলা জবাবটা শোনবার জন্যে একটু দাঁড়াল।

"নামটা জেনে আর তোমার কী হবে? নামটা প্রকাশ করতে সে যখন ইচ্ছুক নয়। তাহলে আসি কেমন?"

ডক্টর বক্সী ট্রামে উঠে পড়লেন। আর এক মহা হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে গেলেন তাকে। রাত্রে ঘুম হল না সুনীলার। মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ল। তার খবরের জন্য কার এমন মাথা ব্যথা? আর এত লোক থাকতে ডক্টর বক্সীর কাছেই বা খবর দেবার এত তাড়া কেন? কী সব বলেছে ওঁকে তাই বা কে জানে? বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকল। আধা ঘুম আধা জাগন্ত অবস্থায় নানা-রকম দৃশ্য দেখতে লাগল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠল, একরাশ চিন্তা নিয়ে। কী করবে ও? অস্থির হয়ে উঠল। স্মৃতি, শিপ্রা, সুরেখা, সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল। কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলল না। এ কি অসভ্যতা। কেন ওর সম্বন্ধে সব খবর ডক্টর বক্সীকে জানানো? না, এর একটা বিহিত করতে হবে। এমন ভাবে সদা শঙ্কিত হয়ে থাকা যাবে না তো হস্টেলে। কিন্তু সত্যি বিচলিত হবার কী আছে? কিছু খারাপ তো বলে নি। আজ বলে নি, কাল তো বলতে পারে। আর ভাল কথা হোক মন্দ কথা হোক, এ অনধিকার চর্চা করাই বা কেন? কে করেছে সেটা জানতে পারলে মতলবটাও বোঝা যেত। সুনীলা ঠিক করে ফেলল ডক্টর বক্সীর কাছে যাবে। আজই যাবে। এ বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে না পারলে হয়ত সে পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু সেদিন গেল না সুনীলা। যেতে বাধ বাধ ঠেকল। কী ভাববেন উনি? এত বিচলিত হবার কী আছে? বিচলিত হবেই বা না কেন? এরকমভাবে থাকা যায় নাকি সদা সর্বদা তটস্থ হয়ে?

বাঁচতে পারে মানুষ ? একটা নিরুপায় বিরক্তি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল সুনীলাকে। নিজের উপর বিরক্ত হল। বিরক্ত হল সেই অদৃশ্য গুপ্তচরটার উপর। গুপ্তচর ? গুপ্তচর বই কি। ডক্টর বক্সীর গুপ্তচর। নইলে উনি কেন নির্বিবাদে একটা অনাত্মীয় মেয়ের সম্পর্কে এমন কৌতূহল দেখান। কী দরকার ডক্‌টর বক্সীর ওর খবরে ? আবার বলা হল ঘাবড়ে না যেতে। যা বলেছে ভালই বলেছে। ভালই যদি বলবে তবে সে সুহৃদটির নাম কেন বললেন না। আড়ালে আবডালে খুব বুঝি ওকে নিয়ে হাসি-তামাশা চলছে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল সুনীলার। বাথরুমে গিয়ে বেশ করে মাথা ধুয়ে এল। কাল সে যাবেই। হয় নামটা জেনে আসবে আর নয়তো স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়ে আসবে, ওকে নিয়ে ওর আড়ালে কোন আলোচনা হয় এটা ও পছন্দ করে না।

ডক্টর বক্সীর দরজা পর্যন্ত মনে বেশ জোর নিয়েই এসেছিল সুনীলা। দোতালা পর্যন্ত উঠে দরজাতে ধাক্কাও দিল। তারপরই শুরু হল ওর কাঁপুনি, ঘামতে শুরু করল। বুকের ভিতর তরল রক্ত বাতাস-লাগা ঢেউয়ের মত ক্ষেপে উঠল। ভাবল ভাল করে নি এসে। ফিরে যাওয়াই ভাল। ফেরবার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা দুটো সবে বাড়িয়েছে, দরজা খুলে এক মহিলা উঁকি মারলেন।

"কাকে চাই ?"

"ডক্টর বক্সীর কাছে এসেছিলাম।"

কথাটা কিভাবে যে বলল ও নিজেই জানে না। ওকে দেখে মহিলাটি সস্নেহে হাসলেন।

"ভিতরে এস।"

পা আর ওঠে না সুনীলার। কোনরকমে একটা ঘরে গিয়ে বসল।

"বস। খোকা তো বাড়ি নেই।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুনীলা। ঘাম দিয়ে ওর যেন জ্বর ছাড়ল। ইনিই নিশ্চয়ই ডক্টর বক্সীর দিদি। টিপ করে একটা প্রণামই করে দিল।

"আরে আরে, থাক থাক। আজকালকার মেয়ে তোমরা কথায় কথায় প্রণাম কর কেন? এখন আশীর্বাদ কী করি বল তো? ভাল বিয়ে হোক, কেমন?"

দিদি মৃদু হাসলেন। সুনীলা লজ্জায় টকটকে হয়ে গেল। কিন্তু খুব ভাল লাগল কথাটা।

"ওমা ওই ছাখো, নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। তোমার নামটা কী ভাই?"

দিদির আত্মীয়তার নিকট-সুরে সুনীলা মুগ্ধ হয়ে গেল। ওর মন ভিজে গেল। চোখে জল প্রায় আসে আসে।

"সুনীলা।"

"অ্যাঁ, তুমিই সুনীলা? তোমারই কথা খোকা এত বলে। তুমি পড় বি, এ? হা আমার কপাল। আমি ভেবেছি কোনও ইস্কুলের মেয়ে বুঝি।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। সুনীলা খুশির চোটে কেঁদেই ফেলল। সুনীলার সঙ্গে দিদির বেশ জমে গেল। খুব কথা বললেন দিদি। সুনীলা শুনল। কত কথা। ডক্টর বক্সীর কথা। ওঁর ছেলের কথা। সুনীলার বাবার কথা। ওদের পড়ার কথা। দিদি বেশ করে খাইয়েও দিলেন। সুনীলা ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল সব। ডক্টর বক্সীর ঘরটা কি ভয়ঙ্কর অগোছাল। সুনীলার ইচ্ছে হল পরিষ্কার করে গুছিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু পারল না লজ্জায়। কিছু যদি ভাবেন শেষে।

"আচ্ছা দিদি, আজ তাহলে যাই? কাল থাকবেন তো স্যর, সকালের দিকে?"

"রোজই তো তাই থাকে। আজ কি কাজ পড়েছে।"

"তাহলে কাল সকালে নটার মধ্যে আসব।"

"আচ্ছা এস।"

হ্যারিসন রোড থেকে রিচি রোড। কিন্তু সুনীলার মনে হল

দুরত্বটা দিল্লির। সুনীলা দোতলার দরজায় ধাক্কা দিতে তক্ষুনি দরজা খুলে গেল। ঝিটা ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে সটান নিয়ে গেল ডক্টর বক্সীর ঘরে।

"আপনি বসুন। ওঁরা বেরিয়েছেন, ফিরবেন এক্ষুনি।

সুনীলা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। ঘরখানা ফিটফাট তক তক করছে। চৌকিটি পরিষ্কার রঙীন বেড কভারে ঢাকা। টেবিলের উপর সুন্দর টেবিল ক্লথ। সুন্দর বাঁধাই নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী। একটা সুদৃশ্য ফুলদানিতে এক ঝাড় রজনীগন্ধা। সুনীলা যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাঃ রে, সবই ওর প্রিয় জিনিস যে। অকস্মাৎ বিদ্যুতের একটা ঝিলিক ওর মাথার মধ্যে খেলে গেল। মনে পড়ল কথাগুলো। ডক্টর বক্সী ওর কী কী ভাল লাগে তারই নিখুঁত ফিরিস্তি শোনালেন সেদিন। তার সবগুলোই তো এখানে। কিন্তু এর অর্থ? অর্থ কী? সুনীলা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। মনের কোন নিভৃত কোণ থেকে এক বিচিত্র অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সুনীলার মনে হয়, এসব তারই জন্য। তার জন্যই এই আয়োজন? এত প্রস্তুতিই বা কেন? তবে কী, তবে কী, থর থর করে কাঁপতে লাগল সুনীলা। যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ল চৌকিটাতে। একটা প্রচণ্ড আবেগে উপুড় হয়ে শুয়ে নরম বালিশটাকে চেপে ধরল দুহাতে।

সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর বক্সীর হাসির আওয়াজটা কানে এল। সুনীলা তাড়াতাড়ি চৌকিটার পাশ ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। সাদা আবরণে মোড়া টেবিলটার দিকে চেয়ে একটু হাসল। হাসিতে লজ্জায় মিশে ওর মুখখানা ফুলদানিতে সাজানো রজনীগন্ধার ঝাড়েরই একজন হয়ে উঠল যেন। ওরা সব উঠে আসছেন জোরে জোরে পা ফেলে, জোরে জোরে হেসে। প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দে প্রতিটি হাসির তরঙ্গে সুনীলার বুকে ঘা পড়ছে একটা করে। ও বোধহয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ওর কানের ভিতর ঝাঁ ঝাঁ শব্দ আর শরীরের উত্তাপ পাল্লা দিয়ে বেড়ে

চলল। দরজায় ঘা পড়ল। ঝি দরজা খুলে দিল। দিদির কথা কানে এল।

"তোমরা ও ঘরে গিয়েই বস। আমরা একটু পরে আসছি। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

দিদি কাকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ডক্টর বক্সী, অকিঞ্চনবাবু আর প্রতুলবাবু ঘরে ঢুকতেই ও উঠে দাঁড়াল।

"আরে তুমি! কতক্ষণ এসেছ?"

সুনীলা আর ডক্টর বক্সীর দিকে চাইতে পারল না। মৃদু হেসে জবাব দিল অকিঞ্চনবাবুর দিকে চেয়ে।

"বেশীক্ষণ না।"

"বস বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

অকিঞ্চনবাবু তারিফ করলেন ঘর সাজানো দেখে। রজনীগন্ধার ঝাড়টা ঘরখানার সুষমা দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অকিঞ্চনবাবু ঝাড়টাকে একটু আলতো ভাবে স্পর্শ করলেন। আলগোছে শুঁকলেন।

"এর মধ্যেই ভোল পালটে ফেললে ভায়া। কদিন পরে কি আব চিনতে পারা যাবে? অ্যাঁ।"

হাঃ হাঃ হাঃ। নিজের রসিকতায় প্রাণ খোলা হাসেন অকিঞ্চন বাবু। সুনীলা দেখল ডক্টর বক্সী লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন, সুনীলাও। তাড়াতাড়ি ওদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারলে বাঁচে।

"আমি দিদির কাছে যাই।"

সুনীলাও পা বাড়িয়েছে আর পিছনের দরজা দিয়ে দিদিও ঢুকলেন।

"এইবার ছাখতো খোকা। সিঁদুর না পড়লে কি বউকে মানায়। কি যে তোদের খৃষ্টানি বিয়ে বুঝি নে বাপু। হুট বলতে সই কর, আর অমনি বিয়ে হয়ে গেল।"

সুনীলা চমকে পিছন ফিরেই থ মেরে গেল। দিদি ঘরে ঢুকছেন, হাতে একটা রূপোর কৌটো। আঙুলে খানিকটা সিঁদুর এখনও লেগে আছে। কিন্তু দিদির পাশে ও কে? লতিকাদি! লতিকাদির সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুরের দাগ? ওর কি চোখ খারাপ হয়ে গেল না কি?

"তোমাকে আর কী দিই লতিকা। আচ্ছা মাছের তেলেই মাছ ভাজি তবে।"

অকিঞ্চনবাবু বিরাট রজনীগন্ধার ঝাড়টা নিয়ে লতিকার হাতে দিতেই মৃদু হেসে মাথাটা একটু নিচু করে ফেলল ও, সবাই হেসে উঠলেন।

"ও মা সুনীলা! দিদি বললেন, তুমি এসে গেছ। বেশ বেশ। এই গ্যাখ তোমার মাস্টারের কীর্তি। না বলা না কওয়া সকালে উঠেই বিয়ে করে নিয়ে এল।"

দিদির কথায় সবাই আবার এক চোট হেসে নিলেন। সুনীলাও হাসল বোধ হয়। সুনীলা ভাবল, হাসাই তো উচিত ওর। ওরও তো আনন্দই করা উচিত। ও কি হাসছে না? হাসছেই তো। কিন্তু সব ঝাপসা ঠেকছে কেন? কিছু ও দেখতে পাচ্ছে না কেন? রজনী-গন্ধার ঝাড়টা কোথায়? টেবিলটা মানাচ্ছে না তো? দরজাটা? দরজাটা কোন দিকে?

বাড়িতে মড়া-কান্না পড়ে যায়।

"ওরে আমার বাপ রে! ওরে আমার মা রে! হা বিধেতা, শেষটায় এই লিখিছিলে আমার কপালে।"

গলা শোনা যায় মেজ বউ কুসুমেরই সব চাইতে উপরে। এই দস্তুর এ বাড়ির। বাড়িতে টালমাটাল আপদ বিপদ কিছু হলেই, কিছু হবার সম্ভাবনা হলেই, পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে কুসুম। আশ-পাশ কাঁপিয়ে। পাড়াপড়শী জানিয়ে।

"ও আমার বাবা রে। ওরে আমার মা রে, হা রে বিধেতা, কার চরণে কী পাপ করিছিলাম রে। আমার কপালডা ক্যান এমনভাবে পুড়ল রে। তার আগে দেহডা ক্যান ভস্ম হল না, ও মা, ওগো বাবা। হে বিধেতা।"

কুসুম কেঁদে ফাটাচ্ছে, কাঁদতে আরম্ভ করেছে আর আর মেয়েরা। ওরা কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে, ফুঁসে ফুঁপিয়ে।

এক পহর রাত তখনও আছে। ড্যাবা ড্যাবা চাঁদটা আকাশে নেই। একটা স্তব্ধ গুমোট অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকাদের ডাকটাও বন্ধ। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। ভোরের আলো চোখ খোলে নি। ভোরের বাতাস পাখা মেলে নি। অন্ধকারের মধ্যে মূর্তিগুলোকে আবছা আবছা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যাচ্ছে এ-ঘর সে-ঘর।

মেজ ভাই কুঁড়োরামই সংসারের সব। বড় ক্ষেত্তর, নামেই, নির্বিরোধ ভাল মানুষ। বোকাসোকা মুখ করে হাত্‌নের এক কোণায় বসে তামুক টানছে। কিছু বোঝবার, কিছু চিন্তা করবার শক্তি আর নেই। যা কিছু কাজ সব যেন জড়ো হয়েছে হুকোটার খোলে।

ফুটোয় ঠোঁট লাগিয়ে তাই জোরে জোরে টানছে। তবু একবার কি করতে যাচ্ছিল। হাঁ হাঁ করে উঠল কুঁড়োরাম!

"তুমি ব'সো, তুমার দরকারডা কী এদিকি আসবার।" কুঁড়োরাম বলে দিয়েছে।

ব্যস্। ক্ষেত্তর নিশ্চিন্ত হয়েছে। মন খোলসা করে তামুক সেজেছে। আর সেই থেকে বসে বসে টানছে। ভাইএর উপর অগাধ বিশ্বাস তার। কত্তে কম্মাতে কুঁড়োই।

বিরাশী বছরের বুড়ি মা, শুয়ে রয়েছে পুবের ঘরে! বুড়ো মাকড়শার মত আঁকড়ে ধরে আছে দুমাসের নাতিটিকে বুকের শক্ত খোড়লের মধ্যে। মাথার ভেতর সব কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে বন বন করে। কী হল? এ কী হল? খানিকটা অস্পষ্ট কষ্ট, খানিকটা আবছা ভয়। ইষ্টিনামও বেভুল হয়ে গেছে। শুধু সজাগ আছে চোখের জল। এক-মাত্র তাই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ভিজিয়ে দিয়ে চলেছে আপন মনে।

কুঁড়োরাম আর বাঁশরীই যা করবার করছে। দৌড় ঝাঁপ। বাঁধা ছাঁদা। গোছ গাছ। আর ঘুরছে ছোট বউ বাতাসী। ছোট্টখাট্ট বৌটি লাটিমের মত পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। মাথায় সেই অন্ধকারেও এক হাত ঘোমটা। ভাশুর-ভাতারের সঙ্গে কোন সময় চোখাচোখি হয়ে যায় তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু। বাড়ির মধ্যে উৎসাহ উত্তেজনা একমাত্র তারই। মেজবৌ যে শুধু শুধু কাঁদতে বসে গেল কেন বাতাসী তার হদিস পায়না কিছু। বেশ তো, ভালই তো হচ্ছে যাওয়া হচ্ছে অন্যত্তর। নতুন দেশ, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ দেখা হবে। কি হবে বাপু এই একঘেঁয়ে এক জায়গায় থেকে। তার বিয়ে হয়েছে দু'বছর। এর মধ্যেই তার হাঁফ ধরে গেছে। তার ভাল লাগেনা এই গ্রাম। বাতাসী [illegible] শহরে থেকেছে। তার বাপ চটকলে খাটত। সে দেখেছে বৈচিত্র্য। শহরের জাঁক-জমক, ঠাঁট-বাঁট। দিদিরা একেবারেই অজ্ঞ। গাঁ ছেড়ে পা বাড়ায় নি কোথাও। তাই ভিটে ছাড়ব ভিটে ছাড়ব করে কান্না।

কুঁড়োরামের হাঁকডাকে ঘর কাঁপতে থাকে। যেমন চেহারা।

দু হাতে বেড় পাওয়া যায় না। তেমনি গলার আওয়াজ। কুঁড়োরামের বাবা ওর ছোটবেলার কান্না শুনে বলত, "বিটা আমার সমুদ্দুরের শংখ গলায় বাঁধে আয়েছে।"

"ও অন্নর মা, আরে ইদিকি আ'সো দিন দেখি। মাগীর কান্না আর ফুরোয় না। ওখেনে পুখো'র কা'টে ফেললো বোধায়।" হাঁক ছাড়ে, "বলি ব'সে ব'সে কাঁদবা না. কুপিডে এটটু জ্বা'লে দিয়ে যাবা। বিধেতা ক্যান্ যে মাগীদের ছিরিষ্টি করিছিলো রে—"

আবার সেই বাতাসীই এসে কুপি দিয়ে যায়।

কুঁড়োরাম বলে, "বৌমা তুমি! ক্যান, ও-মাগীর কি ভাতার মরিছে যে সেই থিকে ঘেংড়ি পাড়তিছে।"

সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলছে কুঁড়োরামের। বড় বিছানার বাণ্ডিলটা চেপে চুপে ঠেসে গোল পাকিয়ে রাখল। দু হাত দিয়ে ঠেসে ধরে হাঁক পাড়ল।

"কই রে বেঁশো, কাতা আনতি কি কলকেতা যাতি হ'ল ?"

বাঁশরী নারকোলের রশি আনল। তারপর দু ভাই মিলে টেনে টুনে বেশ করে বেঁধে ফেলল বিছানাটা।

এক পাশে সরিয়ে রেখে বলে উঠল, "তালি তিনডে হ'ল বিছানা, কি বলিস্। আরু গুডা তুই হবেনে। যা, মারে উঠতি ক'। গুছোয়ে ফ্যাল্ ওঘরের বিছানা গুলোন। ছেঁড়াটেড়াগুলো ফেলে রাখিস। অত বুঝা সামলানো যাবে না।"

কুঁড়োরাম ছুটে যায় রান্নাঘরে। একটা বস্তা টেনে নেয়। ভরতে থাকে বাসনকোসন। হাঁক ছাড়ে, "ও পুটে, তোর মারে পাঠা দিন এ ঘরে। কি আছে কি না আছে সে সব দেখে নিয়া কি বিটাছাওয়ালের কম্ম।"

শেষ পর্যন্ত কুসুম উঠে আসে। ওর কান্না এখন চলে ইনিয়ে বিনিয়ে, ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে এটা ওটা এগিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বাতাসীকে এটা সেটা করতে বলে। আবার কাঁদতে থাকে।

"ও ছোট বউ, কাঁথউচো থালখান দিয়ে যা। মারে জিজ্ঞেস কর দিন, ছিক্ষেত্তরের বাটিডে কনে। ও ছোট বউ, তোর ঘরের খাটের নীচে ছুখোন বগিথাল আছে। জামবাটিডে বোধায় আদাড়ে। ও বুঁচি, মাঁজে দে দিন শিগ্গির ক'রে।"

ছুটো বস্তা নিমেষে ভরে যায়। কত জিনিস? তার কি ঠিক আছে কিছু? গোনাগুনতি আছে? বাপ-পিতাম'র ভিটে ছাড়া চাড্ডিখানি কথা? নাড়ির সঙ্গে যোগ তার। অষ্টপাকের বাঁধন। তামুক টানতে টানতে ক্ষেত্তরের চোখে বারে বারে জল এসে পড়ে। চোখের জল মুছে হুঁকোর খোলে লাগা লালাটা মুছে জোর জোর টান দিতে থাকে। পুরুষ পুরুষের পায়ের ছাপ পড়ে আছে এই বাড়ির আনাচে কানাচে। তার বাবা, তা-র বাবা, তা—র বাবা জন্ম নিয়েছে এখানে। বেড়ে উঠেছে এ বাড়ির ধুলো কাদা মেখে। এ ঝেড়ে যাওয়া সহজ কথা? যেতে চায় নি কেউই, কাল গোটা রাতটাই বচসা হয়েছে। কুসুমকে বোঝাতে সব চাইতে কষ্ট হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোট ধরে বসে ছিল। কুসুমের এক কথা।

"মরি মরবো, শ্বশুরের ভিটেতেই মরবো, যাবো না আর কুথাও।"

থাকতে কি ওদেরই অসাধ! কিন্তু কেউ যে থাকল না গাঁয়ের। মাতব্বর প্রধান যারা, যারা শক্তিমন্ত তারাই থাকতে সাহস করল না। পালাল হুড়হুড় করে, পাকিস্তানে শুধু নাকি মুসলমানরাই থাকবে। হিন্দুদের নাকি স্থান নেই সেখানে, মাতব্বরদের কাছেও ছুটেছিল তারা। মেল্কা সাহেব, গাজী সাহেবরা তো ভরসা দিলেন। ভিটে ছেড়ে যেতে বারণ করলেন। গুজব কথায় কান দিতে নিষেধ করলেন। পাকিস্তান কি, হিন্দুস্থান কি, এই গাঁয়ের মাটি তাদের। সেই ভরসাতেই তো ছিল এত দিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সবাই পালাল বাড়ি-ঘর খালি করে। খালি বাড়ি-ঘর পেয়ে ঢুকতে লাগল বিদেশী বিজাতিরা। কথা বোঝে না যাদের, ভাবসাব বোঝে না, নানারকম কথায় আতঙ্ক বাড়ে। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা দেখে ভয় হয়। তবুও না হয় থাকা যেত, যদি থাকত সবাই, যদি পেত কর্তাদের অভয়, প্রতিবেশী শক্তিমানদের

মরদ ভালবাসা। কিন্তু গাঁয়ের সবাই যখন পালাল, সব কটা গাঁ যখন প্রায় খালি হয়ে এল, যখন কেউ রইল না, টেঁপাখোলায়, হরিনারাণ-পুরে, সরদে'য়, মোষবাতানে, গাঙ দিঘড়েয়, তখন ওরাই বা একঘর কি করে থাকে টিম টিম করে! ওদেরও তো মান সম্ভ্রম আছে। আছে মাগ মেয়ে। তবে? গড়িমসি করতে করতে এতদিন কাটল।

কিন্তু মেয়েদের বোঝাতে পারে যে তার জন্ম হয়েছে নাকি এখনও? বেশী কিছু বললেই ফ্যাঁচ্ করে কান্না। সব চাইতে কোট আবার কুসুমেরই বেশী। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যাব কোথায়? সেটা যেন আর বোঝে না পুরুষ মানুষ। কষ্ট যেন তাদের হয় না। বারো হাত কাপড়ও যাদের কাছা দিতে আঁটে না, শেষ পর্যন্ত বিধান নিতে হবে তাদের কাছে থেকে! গরম হয়ে উঠল কুঁড়োরাম। হাত মুখ নেড়ে মাটিতে পা আছড়িয়ে পাগলা মোষের মত চেঁচাতে লাগল।

"তবে থাক ও-মাগী পড়ে। ওই যে কন্‌থে' যেন আ'য়েছে সব মিনষেরা, যখন মাগীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টা'নে নিয়ে যাবেনে বনবাদাড়ে, তখন ঠিক হবেনে! যেমন বজ্জাত তেমন হওয়া চাই তো।"

যা মুখে এলো তাই বলে গেল কুঁড়োরাম। কুসুম আর আপত্তি করল না। কথা বন্ধ করল কিন্তু কান্না না। এ কান্না একান্ত মেয়েদের।

"ও বউমা!" শাশুড়ী ডাক দিল, "তেঁতুলের আচারের ঠিলেডা আছে ওই শিকেয় ঝুলনো! উডা যেন ভুলে যায়ে না, ক্ষ্যান্তরের আবার ও না হলি খাওয়া হয় না। আর ছ্যাখো কাঁটালের বিচির ঠিলেডাও নিও, বুঝলে? আর পশ্চিমির ঘরের সিন্দুকি পুরোনো ঘিটুক আছে। কিছু যেন ফেলে যায়ে না।"

বুড়ী আরও অনেক কিছু বলতে চায়। কত কী যেন ফেলে যাচ্ছে! কিন্তু মনে করতে পারে না। ভাঁজ-পড়া মগজে সব স্মৃতি জট পাকিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরের এক নিদারুণ অস্বস্তি। একটা শুকনো শক্ত আঠালো ঢ্যালা গলার নলীতে আটকে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পুরোনো চোখের ভাঁজপড়া কোণ

দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে। বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত কমসম করেও, বাদ-সাদ দিয়েও, বিছানার বাণ্ডিল হল পাঁচটা। বাক্স পেঁটরা চারটে। দুটো বাসনের বস্তা। একটা কাঠের নকশা-কাটা হাত-বাক্স। তিনটে মুড়ি-মোয়ার টিন। দুটো গুড়ের ঠিলে। একটা আচারের ঠিলে। তিনটে ধামা ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। পাঁচটা হেরিকেন (মাত্র দুটোর চিমনি আছে)। তবু কিছু নেওয়া হয় নি। যেদিকে চোখ পড়ে, ঘরের কোণে, হাত্‌নের উপর, ছানছেয়, জিনিস-পত্তর রয়ে গেল। গড়াগড়ি, ছড়াছড়ি।

শাশুড়ী বলে, "ও বউমা, বাড়ুন তিন গাছ নিলিই পা'রতে। বিদেশ বিভুঁই ঠাঁই কোন সোমায় যে কোনডের দরকার লাগে কওয়া তো যায় না।"

কিন্তু কুঁড়োরাম নিতে দেয় নি। প্রাণে তারও লেগেছে। বুকের ভেতর তারও হয়েছে খানখান। কিন্তু আক্কেল-হারা হলে তো আর চলে না, তাই শেষ পর্যন্ত সে তাড়া লাগিয়ে ধমকে নিষেধ করেছে। বার বার করে গুনে দেখেছে কুঁড়োরাম। বাঁশরী বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লিস্টি করে নিয়েছে সব। এ ফন্দিটা বাতাসীর। এরা তো রেলগাড়ি চড়ে কালে-ভদ্রে। কায়দা-কানুন জানে না। বোঝে না কিছু। বাতাসী তার বাবাকে দেখত ফর্দ করতে কোথাও কখনও যাবার হলে। তাই এ ফন্দিটা চুপি চুপি বাঁশরীকে ডেকে বলে দিয়েছে। ক্ষেত্তর বুঝ করে নিয়েছে তামাক টিকের কৌটোটা। নিয়েছে হুকোটা আর কল্কেটা।

দু গাড়ি মাল আর একখানা ছইঢাকা গাড়িতে ওরা। ঘরে ঘরে তালা মেরে, বাস্তুভিটে প্রণাম করে, আমশাখারি স্পর্শ করে, যাত্রা করল। ক্যাঁচ্ কোঁচ্ ক্যা-অ্যাঁচ্। চলতে থাকে গাড়ি কটা। খানা-খন্দে ধাক্কা খায়। সর্ব শরীরে ঝাঁকুনি লাগে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ে পেছনটা ঝাপসা করে দেয়। খুশী হয়েছে বাচ্চাগুলো। টেঁপি, পুঁটে, বুঁচি এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ভুলুক মারে। যা দেখে বিস্মিত

হয়। খুশী হয়। ছ মাসের বাচ্চাটা বুড়ীর কোলে শুয়ে অবাক অবাক চোখ দুটো দিয়ে ছইয়ের দোলানি দেখে। আর খুশী হয়েছে বাতাসী। ঘরের গুমোটে ওর বুকে পাষাণ চাপে। খোলামেলায় মনটা ওর হাল্‌কা হয়।

"দেখো দিদি, শহর জায়গা কি সোন্দর। শান-বাঁধানো পাকা রাস্তা। ধুলো নেই, কাদা নেই। অন্ধকার পর্য্যন্ত নেই।"

বাতাসী ফিসফিস করে বলে। চাপা আওয়াজেও খুশির ঝলক টের পাওয়া যায়। জগদ্দল কাঁকিনাড়ার অস্পষ্ট স্মৃতিছবিটা ওর চোখে ভেসে ওঠে। বাতাসীর বাবা কলে খাটত ওখানেই।

কোন কথাই কুসুমের কানে ঢোকে না। মনটা ব্যথায় ব্যথায় দুমড়িয়ে যায়। সমস্ত অনুভূতি জল হয়ে চোখের কোনা বেয়ে বেরিয়ে পড়ে। ন'বছর বয়েসে বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসেছিল। তারপর এক-নাগাড়ে উনিশ বছর। শ্বশুর মরেছে। বড়জা মরেছে। দু-দুটো ছেলে মরেছে। কত কত দিন! বাস্‌। কেবলই মনে হয় কী যেন ফেলে এল। কাকে যেন রেখে এল। ধবধবে পাকাচুলওয়ালা একটা মাথা। চওড়া লালপেড়ে শাড়ি-পরানো আলতা-মাখানো দুখানা পা, কচি কচি কয়েকটা হাত যেন ওকে ফিরতে বলছে। ওর কানে শুধু বাজছে, বৌমা চললে, ও বৌ চললি, মা চললি, চলে গেলি, চলে যাচ্ছিস্‌! আমাদের ছেড়ে যাচ্ছিস্‌! কুসুম আছাড় খেয়ে পড়ে গাড়ির মধ্যে। আঁচলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদে।

বাড়িটাকে আর দেখা যায় না। সুপারিগাছগুলোর মাথা, চিনিটোরা আমগাছটার ডগা আর হাজারখাগী কাঁঠালগাছের মগডালটাকে একটু একটু দেখা যায়। জলে ঝাপসা হয়ে আসে চোখ।

কুঁড়োরাম ছইয়ের আড়াল থেকে হাঁকাড় মেরে উঠতে যায়, "অ্যাই অ্যাই মাগী খবরদার কাঁদবি নে।" কিন্তু চোখের জলে রুক্ষতাটা মিইয়ে পড়ে।

বুড়ী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কোলের উপর নাতিটা নড়াচড়া করছে। গরুর গাড়ির ঝাঁকি খেয়ে হেলে হেলে পড়ছে। বিড় বিড়

করে কী হিসেব করে চলেছে। কী একটা ফেলে এসেছে। মনে করতে পারছে না। কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাথাটা ছিঁড়ে ফেলবে না কি ?

"ও বউমা গয়ার ঘটিডে কই ? তাতে যে একটু গঙ্গাজল ছিল।"

বাতাসী গলা নিচু করে জবাব দেয়, "বট্‌ঠাউরীর কাছে।"

বারো মাইল দূরে লঞ্চের ঘাট। সেখান থেকে ন'পাড়ার ইস্টিশান। তারপর ? তারপর কোথায় কেউ জানে না। কোথায় যাবে ঠিক নেই। কোথাও একটা ঠিক করতে হবে।

টেঁপাখোলার বাজারে অশ্বিনী শিকদেরের সঙ্গে দেখা। হিসেবী লোক। বিপদের আভাসেই সরে পড়েছেন। পরিবারবর্গ নিরাপদ জায়গায় রেখে মালপত্রের বিধিব্যবস্থা করতে এসেছেন।

"কী, সব চললি তাহলি।"

"আর না যায়ে কর্‌বো কী কন্ তো।"

"তা যাওয়া হচ্ছে কনে ?"

"তার কিছু ঠিক হয় নি। আপনারা তো অনেকদিনই দেশ ছা'ড়েছেন। আপনারা এখন আছেন কনে ?"

"আমরা তো নবদ্বীপ আছি।"

"নবদ্বীপ। সে তো ভাল জায়গা। হুজ্জুতহাঙ্গামা নেই; তীর্থস্তান। নিত্য গঙ্গাস্তান, দুবেলা গৌর-দর্শন। ও কুঁড়ো, তবে তো ওখেনে গেলিই হয় রে। কী বলেন অশ্বিনী তাওই, আপনারা পাঁচজন যেখেনে আছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল।"

সন্ধ্যে নাগাত ওরা লঞ্চের ঘাটে পৌঁছাল। এক এক করে নামছে সবাই গাড়ি থেকে। একটা কুকুর এসে ভিড়ে গেল ওদের সঙ্গে। ডাকতে লাগল কুঁই কুঁই। শুঁকতে লাগল এর ওর গা। বেশ কুকুরটা। ঝুমরো ঝুমরো চুল। কুঁতকুঁতে চোখ।

টেঁপির হাতটা আচমকা চেটে দিতেই 'ও মাগগো' বলে টেঁপি দিল এক লাফ। বাঁশরী একটা লাঠি কুড়িয়ে মারতে গেল।

কেত্তর বলল, "আহা, থাক্ থাক্।"

লঞ্চের ঘাটে ভিড়ের অন্ত নেই। লোক। মাল। একেবারে নাগরি-ঠাসা।

বাতাসী ফিস্ ফিস্ করে, "দেশ গাঁয়ে আর লোক থাকবে না বোধ হয়।"

লঞ্চ আসতে না আসতে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। লঞ্চটা আসেও টইটম্বুর হয়ে। একেবারে অ-জ্ঞান লোক। কোনদিন বাড়ি থেকে বের হয় নি। মুলুক সন্ধান জানে না। কায়দাকানুন বোঝে না। ভিড়ে ঢুকতে ভয় পায়। উঠতে পারে না লঞ্চে। লঞ্চ চলে যায়। ওরা সেই চড়াতেই পড়ে থাকে। কুঁড়োরামের মত লোকও হকচকিয়ে যায়।

হুকুম দেয়, "নে, রান্নাবান্না কর্। খায়েদায়ে তো নিই। তারপর গ্যাখবানে।"

চড়ার উপর রান্নাবান্না হল। খাওয়াদাওয়া চুকল। বাতাসী সারাটা দিন যেন বাতাসেই ভেসে বেড়াল। উপচে-পড়া খুশির তোড়ে সামাল দিতে পারে না নিজেকে। বহুদিন বন্ধ ছিল। আটকা ছিল। আজকে খোলা পেয়ে খেলা শুরু করল। খুনসুড়ি করল টেঁপি পুঁটের সঙ্গে। বুঁচিকে রাগিয়ে দিল। কুকুরটাকে দু হাতে চটকাল। কুসুমের ছেলেটাকে কাঁদিয়ে আবার শান্ত করল।

একদিন দু দিন নয়। পর পর চারদিন উঠতে পারল না লঞ্চে। মেজাজ বিগড়ে গেল কুঁড়োরামের। এ উঠতে পারে তো সে পারে না। সবাই পারে তো অত মাল তুলতে পারে না। সময় মেলে না। বার বার ওঠানো নামানো করতে করতে বেসামাল। গালাগালি করে, চেঁচামেচি করে চড়াটা মাথায় করে তুলল কুঁড়োরাম।

"বিধাতা এত থাকতি ক্যান যে গুচ্ছের মাগী ছিরিষ্টি কললেন, তা কবে কিডা। অকম্মার ধাড়ী সব। কুড়ের বাথান।"

কুঁড়োরামের গালাগালির শেষ নেই। একদিন এল কতকগুলো কেমনতরো পোশাক-আশাক-আঁটা জোয়ানমদ্দ লোক। খোলাল

বাক্স। আলগা করল বিছানা। টানা হেঁচড়া। হেনস্থার একশেষ। শেষকালে দশটা টাকা নিয়ে সরে পড়ল। রাগে পাগলা বয়ার হয়ে উঠল কুঁড়োরাম। লাথি মেরে দিল ফেলে নদীতে এক বস্তা বাসন।

কুসুম ছুটে এল : "হাঁ হাঁ। কর কী? কর কী?"

কুঁড়োরামের হাতখানা ধরতে গেল।

"সরে যা মাগী।"

তাড়া দিল কুঁড়োরাম। চোখ ছুটো ভাঁটাফুলের মত লাল করে বলল, "সর শিগ্‌গির। নাকি তোরেও দেব ওখানে ঠেলে।"

মধুমতীর আবর্তিত জলটা দেখিয়ে দিল। কুসুম ভয় পেয়ে সরে যায়।

সেদিন লঞ্চ আসতেই বিছানা ছুঁড়ে, বাক্স ছুঁড়ে, একে ঠেলে তাকে ফেলে, সবাইকে কোন রকমে তুলে দিল।

"হাঁ হাঁ, কর কী?"

"এই—এই, মাথা ফাটাবা নাকি!"

"আরে, ইডা কনকার বেয়াদব রে!"

"চোপরাও!"

"খবরদার!"

"অ্যাই মুখ সামাল!"

বেধে গেল ঝগড়া। ঠেলাঠেলি। ঘুষোঘুষি। ঘুষো খেয়ে কুঁড়োরামের বাঁ দিকে ভুরুর উপর কালশিটে পড়ে গেল। দিল একজনের নাক ফাটিয়ে। ক্ষেত্তর ছুটে এল। বাঁশরী এল। আরও লোকজন জুটে গেল। বুড়ী ইষ্টনাম জপতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল। সারেং এসে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। দু দল দু দিকে সরে গেল। মিটমাট হয়ে গেল। আবার সব চুপ। ভুরুর উপর হাত বুলোতে বুলোতে এক কোনায় রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়াল কুঁড়োরাম। টেপি পুঁটে বুঁচি বাপের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। কুকুরটা পাউড়ি থেকে ওদের দেখে ঘন ঘন লেজ নেড়ে কাতরাতে লাগল কুঁই কুঁই। লঞ্চ ছাড়বার ভেঁপু দিল। বাতাসী ডাঙাটার দিকে চেয়ে

আছে। ওর চোখ জলে ভরে এসেছে। একদৃষ্টে বলন্ত আমড়া-গাছটির দিকে চেয়ে রইল। কালকেও ও আর বুঁচি আমড়ার কুশি খেয়েছে ওই গাছের। কেষ্টর কাকে উদ্দেশ করে প্রণাম করল। পুঁটে কুকুরটাকে হাত বাড়িয়ে ডাক দিল, "আ তু, তু তু উ উ উ।" ঘন ঘন লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা কাতরভাবে ডেকে উঠল, কেঁ-উঁ-উঁ-উঁ। ঝাঁকানি দিয়ে লঞ্চ ছাড়ল। চড়াটা দূরে সরতে লাগল। চড়ার উপর কী যেন একটা পড়ে আছে। চিক চিক করছে রোদ্দুরে।

পুঁটের খুব মজা। লঞ্চের আগে আগে কুকুরটা দৌড়চ্ছে। পুঁটে হাত বাড়িয়ে ডাক দিল, "আয় আয়।" দেখতে দেখতে কুকুরটা লাফ দিয়ে পড়ল জলে। পড়ল একেবারে লঞ্চের সামনে।

"হেই—হেই।"

"আহা-হা, কেটে একেবারে দুখানা হয়ে গিয়েছে গো। কেষ্টর জীবটা। আহা, আহা।"

"দিদি গো। মরে গেল।"

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল বাতাসী। একটা কালো দেহ পাশ দিয়ে ভেসে গেল। লাল লাল জল অনেক অনে—ক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বাতাসীর কানে ভাসতে লাগল কুকুরটার আর্তনাদ কেঁ-উঁ-উঁ-উঁ——অনেকক্ষণ। অনেকদূর। অনেকদিন।

ন'পাড়া ইস্টিশানে নবদ্বীপের টিকিট নেই। রানাঘাটের পাওয়া গেল। মালামাল নিয়ে ট্রেনে চড়াও তেমনি ফৈজত। দু-দু টাকা মোট। গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া অবধি। অনেক দরাদরি। অনেক কষাকষি। অনেক তম্বতোয়াজের পর টাকা টাকা রফা হল। হুড়মুড়িয়ে এসে গেল গাড়ি। তিল রাখবার জায়গা নেই। তবু মানুষগুলো উঠল কী করে! গাড়ি ছাড়ল। কুসুমের আতঙ্ক কাটল খানিকটা। ট্রেনের শব্দ ওদের কানে একেবারে নতুন। কান পেতে শুনতে বেশ ভাল লাগে। ইস্টিশানের পর ইস্টিশান পার হয়ে যায়। আরও মাল ওঠে। আরও মানুষ।

বনগাঁ। জংশন ইস্টিশান। গাড়ি বদলে রানাঘাট। হাঙ্গামা

বাধল মালের টিকিট নিয়ে। সাদা-পোশাক-পরা বাবু এসে মালের টিকিট চাইলেন। টিকিট নেই? ধমক লাগালেন। টিকিট নেই। আবদার। চল থানায়। হাতে ধরা, পায়ে ধরা। অনুনয় বিনয়। কে শোনে? বাবুর ডিউটি যে লোক ধরা। হাতে পেয়েছেন যখন তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। পাকিস্তান থেকে আসছি। আমরা হিন্দু। অসহায় বাস্তুহারা সম্বলশূন্য প্রায়। কিছু জানি নে। কিছু শুনতে চাই নে। লগেজ-টিকিট আছে? দেখাও। নেই? চালান যাও। তবে হ্যাঁ, বিপদে পড়েছ। বিধি-ব্যবস্থা আছে বৈকি। দাও দশটা টাকা। দশ টাকা? ওর কমে হয় না? তবে থানায় যাও। একেবারে আধলাটি খরচ করতে হবে না। বে-আইনী কাজ করেছ। ভোগো তার ফলটা।

পাঁচটা টাকা দিয়ে, বাবা ডেকে, তবে রেহাই পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। আবার নবদ্বীপ ঘাট ইস্টিশানে পাঁচ টাকা। কুলি এক টাকা প্রতি মোট। নৌকা এক টাকা প্রতি মাথা, আট আনা প্রতি মাল।

হুড় হুড় করে বেরিয়ে গেল জমি-বেচা টাকাগুলো।

কুঁড়োরাম, বাঁশরী আর ক্ষেত্তর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। লোকগুলো কি হাঙ্গর? চড়ার উপর বসে বসে বাহারে বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে রইল তিন ভাই। যত রাজ্যের আশঙ্কা আতঙ্ক ভয় সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘিরে ধরল। সহানুভূতিহীন অপরিচিত জায়গা। কোঠা বাড়িগুলো মনে হল রাক্ষসের পেট। কবন্ধ সব রাক্ষস। আজকের মত চড়াতেই থাকা যাক। এই বটগাছটার নীচে। গঙ্গায় নাও ধোও। বাপ-পিতামোকে উদ্দেশ করে দু গণ্ডূষ পুণ্যবারি দাও। ততক্ষণ একটু অশ্বিনী তাওইয়ের খোঁজ করে আসা যাক। ওই পথে খাবার-দাবার কিনে আনলেই হবে। বেরিয়ে পড়ল কুঁড়োরাম আর বাঁশরী।

অনখা জায়গায় এসে হকচকিয়ে গেছে বুড়ী। চুপ মেরে গেছে কুসুম। ক্ষেত্তরের মন ভক্তিরসে ভরোভরো। সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে যত, তত ক্ষেত্তর দুলে দুলে হরিনাম করে চলেছে গুনগুন

করে। উৎসাহ শুধু বাতাসীর। ভরা খুশিতে ছলকে পড়ছে। সব নতুন। সব ভাল। চড়াটা, বুড়ো ঝাঁকড়া বটগাছটা। পাটনিদের সুর করে চিৎকার। সব ভাল লাগে বাতাসীর। পাটনিরা কেমন সুর করে চেঁচায়।

"সোরকারবাবু, সাতান্নো নোম্বোর। নয়টা লোক সাতটা মোওট। সাতান্নো নোম্বোর।" মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকে বাতাসী। নয়টা লোক সাতটা মোওট। মোটটা কেমন টেনে টেনে বলে ওরা। বাতাসীর হাসি আসে।

এ-যে মস্ত শহর। অজগরের মত অজস্র রাস্তা। সাপের জিভের মত অসংখ্য গলি। কোন্ মুখে যাবে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? কুঁড়োরাম অস্বস্তি বোধ করে। দিশে পায় না বাঁশরী। ওরা মোড় গুনে, চিহ্ন রেখে এগুতে থাকে। যত এগিয়ে যায় ওরা ততই শহর বাড়তে থাকে। রাত্তির হয়। লোহার খুঁটোর উপর ঠুঙি-পরা বিজলী বাতি ঝিলিক মেরে জ্বলে ওঠে। এবার দুজনে ফেরে। সম্ভব নয় এই ভিড়ের মধ্যে অশ্বিনী তাওইকে খুঁজে বের করা। মানুষের অরণ্যে পথহারা হবার আশঙ্কা তাদের বিচলিত করে। অশ্বিনী তাওইয়ের কাছ থেকে ভাল করে ঠিকানাটা নেওয়া উচিত ছিল। এঃ, বড্ড গু'খুরি হয়ে গেছে!

সে রাতটা কোন রকমে কাটল। ভোরবেলাতেই কুঁড়োরাম বাড়ির খোঁজে বের হল। অশ্বিনী তাওইয়ের আশা ছাড়তে হল। খোঁজাখুঁজি করে ধরল এক দালালকে। দালালের চোখে-মুখে কথা। করিৎকর্মা লোক বটে।

"বাড়ি? কটা বাড়ি চাই বলুন না। পাঁচ মিনিটে বাড়ি করে দেব, চলুন। এসেছেন বিদেশ থেকে কত কষ্ট করে, আর আমরা এটুকু করব না?"

কী মিষ্টি কথা! এখানে এত মহৎ লোক থাকে? হবে না, এত বড় একটা তীর্থস্থান। ঠাঁই নিতে হয় তো বৃহৎ স্থানে নাও। এ

বাড়ি সে বাড়ি করে অনেক বাড়ি ঘুরে অনেক বাড়িই দেখাল দালালটি। সবই কোটা বাড়ি। একটা পছন্দসই বাড়ি মিলল। ভাড়া কত? তিরিশ টাকা। পাগল! অত টাকা কোথায়? আট-দশ টাকার মধ্যে হয় না? আট-দশ টাকায় বাড়ি মেলে না এখানে। আবার দর-কষাকষি, হাত কচলা-কচলি। শেষটায় বারো টাকায় রফা হল। তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম। পঞ্চাশ টাকা সেলামি। আর দালালি পাঁচ টাকা। এক থোকে একানব্বুই টাকা দালালের হাতে গুনে দিল কুঁড়োরাম। ভাঙাতে হল শেষ সম্বল একশ টাকার নোটটা। থাকল মাত্তর নয় টাকা। যাক মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো জুটল। পরে বিচার করা যাবে। ভাবা যাবে বারান্তরে।

"বিকালে এসে বাড়ি খুলে দিয়ে যাবো'খন। চাবিও তখন দিয়ে যাব। যাবেন না যেন কোথাও বেবিয়ে।"

"না না, যাব আর কোথায়? আপনি আসবেন শিগগির করে। আজই ও-বাড়িতে উঠা চাই।"

"বিলক্ষণ। সে আর বলতে। গাছতলায় কি থাকা যায়! আমি ঘরগুলো ধুয়ে রাখাব'খন।" দালাল চটপট চলে যায়।

"মহাশয় ব্যক্তি," ক্ষেত্তর বলে। "শ্রীধামে আশ্রয় যে পেলাম এত বাপ পিতাম'র পুণ্যে।"

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। গঙ্গার জলে সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়। সন্ধ্যা গাঢ় হয়। রাত্রি গভীর হয়। ভোরের সূর্য গঙ্গার জলে আলো ফেলে। কিন্তু দালালটি আর ফিবল না। সমস্ত রাত কটি প্রাণী গাছতলায় বসে কাটায়। ছোটরা গুটিশুটি মেরে ঘুমোয়। রাতের ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেশে ওঠে। বড়দের চোখে ঘুম নেই, জল নেই, আগুন নেই। পাথর হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয় না এতবড় প্রবঞ্চনা। অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্তরের মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হয়, "ভগবান!"

আশ্রয় একটা পাওয়া গেল। যোগাড় করে দিলে ওখানকারই

একজন লোক। নাম তার সুন্দর গোঁসাই। আধাবয়সী এই লোকটা বাস্তুহারা-ত্রাণ-সমিতির সম্পাদক। গায়ে পড়েই আলাপ করল। নিজের উদ্যোগে ঘরখানা ভাড়া করিয়ে দিল। ঘর দেখে ওদের তো চক্ষুস্থির। দেশের বাড়িতে ভাঙাচোরা হলেও চার পোঁতায় চারখানা ঘর ছিল। এখন এই একখানা ঘুপ্‌সি অন্ধকার কুঠরিতে সবাই মিলে থাকবে কী করে?

সুন্দর গোঁসাই এক গাল হেসে বলে, "তাও তো পেলেন মশাই। আপনাদের আশীর্বাদে সবাই একটু মান্যগণ্য করে, সহায় সম্পত্তি কিছু আছে এই নগরে। তাই কোনরকমে এটুকুন যোগাড় করতে পেরেছি।"

কথাটা সত্য। কুড়োরাম জানে। একদিনেই ওর চরম আক্কেল হয়ে গেছে। বারান্দায় রাঁধবার জায়গা। ওইখানেই খেয়ে নিতে হয়। তারপর ঘরে গিয়ে সব ঢোকে। পুরুষরা এক দিকে, মাঝখানে নাতি-নাতনীর দঙ্গল নিয়ে বুড়ী, ওপাশে বৌরা। বাতাসীর চিরকেলে অভ্যাস আগোছাল আলুথালু শোয়া। একদিন ঘুম ভাঙতেই কুড়োরামের নজরে পড়ল ঘুমন্ত বাতাসীর অগোছাল কাপড়-খসে-পড়া দেহটা। চোখ বুঁজে টলতে টলতে বেরিয়ে এল কুড়োরাম বাইরে। মরমে মরে গেল। ইচ্ছে হল চোখ দুটোকে অন্ধ করে দেয়। ছি ছি ছি! ভাদ্দর-বৌয়ের আব্রু রক্ষা করবার সামর্থ্য নেই তার। সেদিন না-খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করল। ঠাকুরবাড়ি জল বাতাসা দিল। গঙ্গাস্নান করল। সেই দিন থেকে কুড়োরাম বাইরে শুতে লাগল।

কুসুম বিপদে পড়ে গেছে খুব। বুড়ীর বুকে পিঠে ব্যাথা। গলা দিয়ে রাতদিন ঘড় ঘড় শব্দ বের হয়। মাঝে মাঝে কোন রকমে ডাক দেয়, "বৌমা।" কুসুম উঠে আসে। বুড়ী কিছু বলতে পারে না। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। পিঁচুটিতে আটকে থাকে চোখ। ছোট ছেলেটার হাম হয়েছে। রাতদিন চিৎকার করছে। বাতাসী সামাল দিয়ে উঠতে পারে না। পুঁটের পেট নেমেছে কদিন থেকে, সারবার লক্ষণ নেই।

তবুও সুন্দর গোঁসাই ছিল তাই চলছে। কুঁড়োরামকে ভরসা দেয়। বারান্দায় বসে পরামর্শ হয়। বাজারে একটা ছোট দোকান করবে কুঁড়োরাম। এই মনে সাধ। টাকা কিছু যোগাড় করে দেবে গোঁসাই। কথায় ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁক দিয়ে নজর পড়ে গোঁসাইয়ের। বাতাসী উবু হয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে। আধখানা স্তনাভাস গোঁসাইয়ের চোখে ছাপ ফেলে।

ক্ষেত্তরের সঙ্গে সুন্দরের খুব জমেছে।

"জ্ঞানপথে কতদূর যাওয়া যায়? কতদূর যেতে পারে? জ্ঞানী-পথে অহংকে তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছু লভ্য নয়। ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠ পথ। সব কিছু তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বগল বাজিয়ে পথ চলা যায়। হরি হে দয়াময়!"

দরজার ফাঁক দিয়ে নজর চালায়। বাতাসী উঠে গেছে। রসের কথা আর তেমন জমে না। তবু সুন্দর গোঁসাই যা করবার করেছে। দোকান-ঘর খুঁজছে। ওদের বিনা ভেটে গৌরদর্শন করিয়েছে। নবদ্বীপে এ প্রতিপত্তি বড় কম নয়। যমরাজ ভুল করে হয়তো রেহাই দিতে পারে। কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্রের পাহারাদাররা পাঁচ আনা এক পয়সা বাজিয়ে না নিয়ে কাউকে মন্দির ঢুকতে দেবে না। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, ততোধিক ক্ষণস্থায়ী এক-একটা গোঁসাইয়ের পালা। তার মধ্যে বিনা ভেটে মাছিকেও ঢুকতে দেওয়া নয়। সওয়া পাঁচ আনা ভেট দাও প্রভু দর্শন কর। ফোকটে পুণ্য অর্জনও জুয়াচুরি। তবে সুন্দর গোঁসাইয়ের কথা আলাদা। সে নিজের আত্মীয় বলে ওদেরকে দেখিয়ে আনল সব। ক্ষেত্তরের রোমাঞ্চ হয়। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। চোখ বুজে ধ্যান করে। কে ভাবতে পেরেছিল? কে জানতে পেরেছিল ওর এ সৌভাগ্য হবে?

জমা পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যায়। যা দু-একখানা সোনাদানা ছিল তাও অদৃশ্য। অত বড় বাসনের বস্তাটা একেবারে চুপসে গেছে।

"এবার টেরেনে চড়া যাবে অনেক সহজে। কত বোঝা হালকা হয়ে গেছে দেখিছিস!"

ঝুঁড়োরাম রসিকতা করতে যায়। ঠিক জমাতে পারে না। জমে ওঠে না। সুন্দর গোঁসাই বলেছে, রাস-পূর্ণিমা না গেলে আর কোন বিধি-ব্যবস্থা হবে না।

রাস-পূর্ণিমার ভাসানের দিন সে কী ভিড়। সমস্ত রাস্তা মানুষ ঠাসা। ওদের বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। সুন্দর গোঁসাইয়ের পীড়া-পীড়িতে আর 'না' বলতে পারে নি। এমন উৎসব দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে! আর নবদ্বীপে থেকেও এ উৎসব দেখবে না, তা কি হয়! বুড়ী নাতি-নাতনী নিয়ে বাড়িতে আছে। শরীর ভাল হলেও দুর্বলতা আছে। বাপ রে, কী ভিড়! বাতাসীর শরীর যেন গুঁড়িয়ে যাবে। এত ভিড়ে না এলেই ভাল হত। এক-একটা ঠাকুর আসছে। ডগর কাড়ায় ঘা পড়ছে কড়ড় কড়ড়। শানাই বাজছে। ঢোল কাঁসি। মদ খেয়ে চুর হয়ে ছেলে বুড়ো কোমর বাঁকিয়ে নাচছে। আর খিস্তি গান। নাচ দেখে বাতাসীর খিল খিল করে কী হাসি! কুসুমও হেসে ফেলে। মরণ! গান শুনে কানে আঙুল দেয়। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। কী বড় বড়, কত রকম রকম ঠাকুর। গোনাগুনতি নেই। হঠাৎ গোলমাল বাধে। মারামারি। ঠেলাঠেলি। কুন্থইয়ের চাপে বাতাসী ছিটকে পড়ে। দল-ছাড়া হয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে, "দিদি গো!" পেছন থেকে কে যেন হাত চেপে ধরে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে কানের সঙ্গে ঠোঁট লাগিয়েই বলে ওঠে, "ভয় নেই।"

বাতাসী ফিরে চায়। সুন্দর গোঁসাই। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। হাত ধরে টান মেরে বলে, "চল, বাড়ি পৌঁছে দিই।"

বাতাসী আর ফিরল না। দু দিন ধরে খোঁজাখুঁজি। তোলপাড় করে তুলল শহর, কিন্তু নেই। বাতাসীর পাত্তা নেই। সুন্দর গোঁসাইয়েরও আর দেখা নেই। ওদের আশেপাশে আতঙ্ক ভয়। নিরুপায় ক্রোধ। আর উপরে নিরাবলম্ব আকাশ। কেউ ভাবে না। কেউ কাঁদে না।

না, কুসুম কাঁদল সেদিন। আছাড় খেয়ে পড়ে কুসুম। বুকফাটা কান্নায় পথের মানুষ জড় হয়।

"ওগো, আমার কী হবে গো! ওরে আমায় ফেলে কনে গেল গো! ও বাবা!"

বুড়োরাম নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা পায়ের উপর খুঁড়ে খুঁড়ে কুসুম কাঁদছে। ছেলেমেয়েগুলো তারস্বরে চেঁচায়। ক্ষেত্তর গুম মেরে বসে থাকে। বুড়ী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা। ছোট্ট নাতিটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, "ঘুমো দাদা, ঘুমো"। ছেলেটি কখন ঘুমিয়েছে। বুড়ী তবুও বিড়বিড় করে বলে চলেছে, "ঘুমো দাদা, ঘুমো।"

বাঁশরী লোকজন ডেকে আনে, বাঁশ দড়ি আনে।

"যা শালা কলেরার মড়া। এই যে ও দাদা ঝাড় দিখিনি গোটা তিনেক টাকা। একটু মাল আনিয়ে নিই।"

বাঁশরী বিনা বাক্যে টাকা বে' করে দেয়। মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার আসে। সকলের হাতে কলেরার টিকে দেওয়া হয়। গাদি গাদি বিছানা পোড়ানো হয়। ঘর দুয়ারে ছিটানো হয় ওষুধ। সাদা সাদা পাউডার।

রাতের অন্ধকার আবার ফিকে হয়ে আসে। আবছা আলোয় ওদের ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায়। আজ আর দৌড় ঝাঁপ নেই। হৈ চৈ নেই। বাঁশরী বুড়ির হাত ধরে এক হাতে। অন্য হাতে একটা মোট। ক্ষেত্তর কাঁপতে কাঁপতে হাঁটে। কুসুম ছেলেটাকে কাঁখে করে। পুঁটে, বুঁচি, টেপির হাত ধরে চলতে থাকে। মনে হয় দুখানা অদৃশ্য হাত পেছন পেছন আসছে। বসাবে বুঝি আর এক খাবল। কুসুম প্রাণপণে সামনে চেয়ে থাকে।

খেয়া ঘাটের নৌকো দুলে ওঠে। দাঁড়ের শব্দ হয় নিস্তব্ধ গঙ্গায়। ছপ্ ছপ্ ছপাৎ। মাঝি একবার সবাইকে গুনে নেয়।

তারপর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে হেঁকে ওঠে, "সোরকারবাবু, আট লম্বর। ছোয় জন লোক আর একটা মোট আছে। সাত জন লো-ও-ক।"

এমনি ডাক সেদিনও শুনেছিল কুসুম। যে দিন ওপার থেকে

এপারে আসে। মাঝির সুর করা ডাকটা বাতাসীর মুখস্থ ছিল।

প্রায়ই বলত, "ও দিদি, শোন শোন। সোরকারবাবু নোয় জন লোক, আর সাতটা মো-ও-ট। সাতাননো নম্বর।"

মাঝির হাঁকে চমকে ওঠে কুসুম।

"সোরকারবাবু সাত জন লোক। আঠ লম্বর নৌকা। সাত জন লোক আর একঠো মো-ও-ট।"

# একটি প্রতিশোধের কাহিনী

সেলুনটাতে ভিড় দেখে মেজাজটা বেজায় খিঁচড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় ঠিক কী! চলে যাবার উপায় নেই, এই আধটি ঘণ্টাই যা ফুরসত। তারপরই তো জুড়ে যেতে হবে ভবের গাছে।

মেঘলা আকাশ। বেশ খানিকটা বৃষ্টি ঝরে এখন একটু ধরেছে। গলিটা প্যাঁচ প্যাঁচ করছে কাদায়। চটিটার কাদাভেজা শুকতলায় পা লাগছে আর সিরসির করে উঠছে সর্ব শরীর। বিরক্তির হাত এড়াতে মোক্ষম দাওয়াই হচ্ছে চুরুট। চুরুট কিনতে মোড়ের সিগারেটের দোকানে গেলাম। চুরুটটি ধরিয়ে ছুটো টান দিতেই মেজাজটা বশে এসে গেল। বেশ ভাল ঠেকতে লাগল মেঘলা দিনের ঠাণ্ডা-বাতাস-গায়ে-লাগা আবহাওয়া। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম শ্রাবণের আকাশে মেঘের ঘন সমারোহটি।

কখন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে গেলাম আচমকা সম্বোধনে।

"আরে, বাবুমশাই যে!"

চেয়ে দেখি শশী আচার্যি। ঠিক অবিকল আগের চেহারাই বজায় আছে। তেমনি রোগা পাকাটে। কপালে ত্রিবলী রেখা। গর্তে-ঢোকা চোখ। হাতে একটা মস্ত আতস কাঁচ আর গোটা পাঁচেক পুরনো পঞ্জিকা।

"কী বাবুমশাই, চিনতে পারছেন না?"

একটু ম্লান হেসে বলল।

"বিলক্ষণ, তোমাকে চিনব না, বল কী হে!"

অন্তরঙ্গ সুর এনে আমি বলি। বলতে কী ওকে দেখে খুশীই হই খানিকটা।

জিজ্ঞাসা করি, "ব্যবসাটা চলছে কী রকম ?"

শশী এক গাল হেসে বলে, "আজকাল একটু ভালই চলছে। আপনাদের আশীর্বাদ। পাড়াটা আবার জমে উঠেছে কিনা।.. যজমান অনেক বেড়ে গিয়েছে। মাগীদের পুজো-আর্চাও বেড়েছে কিছুটা।

বলেই গলিটার দিকে একটা নজর দেয়। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটটার ভেতর যতদূর দৃষ্টি চলে হাতড়ে নিই।

শশী আচার্যি বেশ্যাদের পুরুত। শশী-পুরুতের পসার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মুখ থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত একচ্ছত্র। বেশ্যাদের পরলোকের পথে যাত্রা জমাবার ওই একমাত্র কোচওয়ান। এ ছাড়া হাত দেখা এবং মেয়েদের দালালি করাও ওর পেশা। এক বড়লোক বন্ধু জৈব কামনা নিবৃত্তির বাসনায় একদিন এ গলিতে পা দিয়েছিলেন। সঙ্গে আমিও ছিলাম। সেদিন ও-ই ছিল আমাদের পথ-প্রদর্শক। এ বিষয়ে ওর জুড়ি এ তল্লাটে পাওয়া ভার। অন্তত অভিজ্ঞ পথিকদের ধারণা যে মিথ্যে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তা বলতে পারি। আমাকে সেদিন শশী এমন মেয়েমানুষই একটা জুটিয়ে দিয়েছিল যে আমার সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পাকা দুটি বছর সময় লেগেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, সৈরভীর আকর্ষণ এখনও যেন নাড়া দেয়।

"চল শশী, চায়ের দোকানে বসি।"

আমি ওকে ডাক দিই।

"হেঁ-হেঁ, বাবুমশাই চিরদিনই আমার উপর সদয়।"

শশী বিগলিত হয়ে হাসতে থাকে।

চায়ের টেবিলে বসে চায়ে চুমুক দিই। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

"এমন দিনে চা বড় পানসে লাগে। !একটু 'খাঁটি' হলে ভাল হত। কী বলেন বাবুমশাই ! চায়ে সব সময় কেমন যেন শানায় না।"

শশী সমর্থনের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকায়। আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। এই জন্যই শশীকে আমার এত ভাল লাগে। ঠিক মেজাজ বুঝে দাওয়াই বাতলাতে ওর জুড়ি দেখি নি।

ভালো বলেছ শশী। আজ যা একখানা দিন। একটু চাঙ্গা হতে পারলে বেশ হত।"

আমার সমর্থনে শশীর উৎসাহ বেড়ে যায়।

সে বলে ওঠে, "তবে চলেন না বাবুমশাই, ঘনা সা-র ওখেনে। আঃ, জমাটি অমন জায়গা আর ছুটি নেই।"

শুনে ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু পকেটের কথা স্মরণ হতেই তা আবার তক্ষুনি মিইয়ে যায়।

বলি, "আজ থাক্ শশী। মাসের শেষ কিনা।"

শশী বলে ওঠে, "তাতে কী হয়েছে, ও-মাসে দেবেন। এ শম্মা সাথে থাকলে এ পাড়ার সবই ধারে পাওয়া যায়। আপনাদের আশীর্বাদে এ পাড়ায় শশী পুরুতের একটা 'কেডিট্' আছে।"

ইংরেজী ক্রেডিট্ শব্দটির অপভ্রংশের উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে ওঠে। এর উপর আর কথা চলে না। চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে দুজনে চলতে শুরু করি ঘনা সা-র দোকানমুখো।

রাস্তায় যেতে যেতে শশী বলে, "কই, আর তো আসেন না সৈরভীর ওখেনে।"

"না, একে কাজকর্মের চাপ, তার ওপর পয়সাকড়ির টানাটানি, বুঝতেই তো পার।"

"তা বটে।"

শশী মাথাটা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করে। তারপর খানিকটা চুপচাপ চলবার পর হঠাৎ বলে ওঠে, "তা গেলেই পারেন দু-একদিন। মাগীটার কেমন যেন একটা টান পড়ে গিয়েছিল আপনার ওপর।"

হঠাৎ বলে ফেলি, "আচ্ছা, যাব একদিন।"

"হ্যাঁ, যাবেন।" বলেই শশী চুপ মেরে যায়।

ঘনা সা আমাদের দেখেই উঠে আসে।

"আসুন আসুন, এস হে পুরুত।"

দোকানের ভেতর ঢুকে যাই। ভেতরটা ঝাপসা অন্ধকার,

জায়গাও কম। তবু অ্যালকোহলের গন্ধে মেজাজটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অনেক দিন পরে দোকানটাতে আবার ঢুকলাম।

"সা মশাই, খুব খাঁটি এনো কিন্তু, ঠকিও না বামুনের ছেলেকে এই বিষ্যুতবারের দিনে।"

"তোমাকে যে মদে ঠকাবে সে তো মায়ের গভ্ভে হে পুরুত মশাই।"

সা ওধার থেকে বলে ওঠে।

একটা মাতাল জড়িত কণ্ঠে যোগান দেয়, "হ্যাঁ হ্যাঁ বাওয়া, শশী এক্‌স্‌পার্ট লোক, বোতলের ওজন দেখে আসল কি নকল বুঝতে পারে। ওখানে চালাকি না ব্রাদার্‌র্‌।"

শশী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে।

বলে, "হেঁ-হেঁ, আপনাদের আশীর্বাদে বারো বছর বয়েস থেকে নেশা করতে লেগেছি।"

ক্রমে ক্রমে একথা সেকথার পর নেশা জমতে থাকে। গলা দিয়ে মদ যত চুঁইয়ে পড়ে পেট তত আলগা হয়ে ওঠে আমার। শশীর কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই।

সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, "বিয়ে করেছেন?"

"নাঃ," জবাব দিই।

"কেন বাবু মশাই বিয়ে করেন নি?"

"পয়সা কোথায়? খাওয়াব কী?

"তা যা বলেছেন। এ তো ভাড়া-করা মেয়েলোক নয় যে পয়সা থাকল গেলাম। নচেৎ কেটে পড়লাম। তোমার পয়সা থাক্ বা না থাক্ তোমার মাগকে বাওয়া খ্যাটন জুগিয়ে যেতেই হবে। কী বলেন?"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ওপাশের মাতালটি কথা লুফে নিয়ে বলতে শুরু করেছে। সমর্থনের আশায় আমাকে প্রশ্নটা করেই আবার ঢলে পড়ল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "বিয়ে অত সোজা কাজ নয়।"

শশী যেন সে কথায় কান দিল না।

বলল, "তবু পরিবার হল একটা আলাদা জিনিস। তার কাছে যা পাওয়া যায় ভাড়া-করা মাগের কাছে কি তা মেলে?"

তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে উঠল, "আর বয়েস হয়ে পড়েছে, এখন আর নতুন করে আরম্ভ করার উপায় নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে। বাইরের বিষণ্ণ আবহাওয়া ওর মুখে-চোখে-নাকে ভর করেছে। বেশ্যার দালালও ভাবুক হয়ে উঠেছে। মদের কী আশ্চর্য মহিমা। শশীর রূপান্তর হচ্ছে।

"তা হলে একটা আশ্চোয্য খবর বলি আপনাকে।" শশী নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসে, তারপর সা-কে হুকুম করে, "সা মশাই, আধ গেলাস বিলিতী দাও।"

সা মদ দিয়ে যায়। শশী একটু একটু করে সেটা শেষ করে ঝিম মেরে বসে থাকে।

তারপর বলে, "জানেন বাবুমশাই, সৈরভী হচ্ছে আমার পরিবার।"

আমি চমকে উঠি, "পরিবার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," শশী ম্লান হেসে বলে, "তবে বিয়ে-করা নয়। ওকে নিয়ে আমি ভেগে আসি কলকাতায়। সে আজ পনের বছর হল। আরও মজা কি জানেন, বয়সে ও আমার মেয়ের মতই ধরতে গেলে। কিন্তু কী বিধিলিপি দেখুন, আমারই সাথে ও সব ছাড়ল। শুধু তাই নয়, আমরা পাঁচ বচ্ছর ঘর করেছি স্বোয়ামী ইস্তিরির মত। তারপর খালি পেটে আর পিরীত কতদিন চলে বলুন? একদিন ট্যাঁকে টান পড়ল। তারপর 'কোমে' 'কোমে', বুঝলেন না। ও সা মশাই, আন হে আর আধ গেলাস।"

সা মদ ঢেলে দিতেই শশী এবারে এক ঢোঁকেই তা শেষ করে দিল। মুখটা হাতের চেটো দিয়ে মুছে আবার শুরু করল।

হঠাৎ একটু হেসে নিয়ে বলতে লাগল, "অথচ মজা কী জানেন, ও কিন্তু কিছুতেই এ পথে আসতে চায় নি। কত কসরত কত মেহনত

কিন্তু কিছুতেই লাগাম পরতে চায় না। তবে আমিও শশী আচায্যি। স্বনামখ্যাত রঘু আচায্যির বংশে জন্ম। রঘু আচায্যি ছিলেন বাগদমূলার সাত আমির দেওয়ান। যার বুদ্ধিবলে বিটিশকে পর্যন্ত ঘোল খেতে হয়েছিল।"

শশী তার স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষকে দু হাত তুলে প্রণাম করল।

তারপর শুরু করল, "সেই মহাপুরুষের সন্তান আমি। বাবা বলতেন, তাঁর চেহারার সাথেও নাকি আমার চেহারার খুব মিল। আমার সাথে টেক্কা দেবে একটা মেয়েমানুষ! ওল যত বড়ই হোক তবু মাটির নীচেই থাকে, বুঝলেন। একদিন কৌশল করে দিলাম মদ খাইয়ে বেশ করে। নেশাটা জমে উঠতেই ওর ঘরে একজনকে ঢুকিয়ে দিলাম শিকল তুলে। খদ্দেরও ঠিক ছিল। আপনি তো ওর চেহারা দেখেছেন। বয়েসকালে আরও খাস্তা ছিল। মুনির মন টলে যেত। অনেক বড় বড় লোক আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে কতবার। কিন্তু বাগে আনতে পারি নি। আমি আশ্চয্য হই বাবুমশাই এই ভেবে যে, ও-মেয়ের মন আমায় দেখে মজল কী করে? যা হোক, সে রাত তো রঙে রঙে কাটল। ভোর রাতের দিকে দুমদাম হৈ চৈ চিৎকারে বাড়ির লোক জড়ো হয়ে গেল। ভেতর থেকে মারামারির শব্দ পেয়ে শিকল খুলে দিলাম। আলুথালু বেশে সৈরভী প্রায় ন্যাংটো হয়েই ঘর থেকে বেরোল। দেখি ওর বাঁ গাল দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। কামড়ের দাগ পষ্ট হয়ে রয়েছে। ওই যে কালো দাগটা দেখেন, সেইটে। আমাকে দেখেই যেন ওর চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল। ক্ষ্যামতা থাকলে ভস্মই করে দিত বোধ হয়। ভূতে-পাওয়া মেয়ের মত দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'হারামজাদা, তুই আমাকে নষ্ট করালি! শেষ পর্যন্ত নষ্ট করালি বিশ্বাসঘাতক! যদি দিন পাই আমি এর সুদে আসলে আদায় করব।' বলেই ছুটে পাশের একটা ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের ভেতর গোঙানি শুনে দেখি সেই হারামজাদা যন্ত্রণায় ধেংড়ি পিটছে। সৈরভী বোতল মেরে ওর মাথা ফাঁক করে দিয়েছে।"

একটু থামল শশী।

তা-কে হুকুম করল, "বেশ, দাও হে, একটু কড়া রকমের দাও। সিকিই না হয় দাও। পুরো বোতলই দাও। আজ একটু দমকা খরচা করে নিই। যা হয় হবে।"

একটুও গলা কাঁপছে না শশীর। একটুও বেচাল হয় নি সে। সা বোতল নিয়ে এল এবার।

আমার দিকে চেয়ে বলল, "বাবু, আপনাকে ?"

আমার হয়ে গিয়েছিল।

মাথা নেড়ে বললাম, "নাঃ, আর না।"

শশী বোতল থেকে একটু ঢেলে নিয়ে খেল।

"সেদিন সৈরভীর কাণ্ড দেখে আমার হাসি এল। আমার সাথে বেরিয়ে এলি তাতে জাত গেল না। আর অন্য লোক ঢুকতেই তোর জাত ছুট হল! কত রকম লোক যে দেখলাম ভুবনে তার ঠিক নেই। সাতান্নটা মেয়ের সাবিত্তি ভেঙে দিয়েছি বাবুমশাই। নতুন নতুন অনেক শম্মাই নানা রকম বলে থাকে। কাঁদে। শাপ মন্যি দেয়। আমি হাসি। বেশ্যার শাপে বামুন হবে খোঁড়া? হুঁ! কত দেখলাম পোথোম পোথোম ফোঁস ফোঁস। দু দিন বাদে সেই জলবত্তরলং। আপনি নিজ চক্ষেই তো দেখেছেন সৈরভীর পরেকার ব্যাভার। মেয়ে-লোকেরা যেন রবাটের ফিতে। যে মাপে লাগাও তাতেই লেগে যায়। আবার বলে কিনা পোতিশোধ নোব! হুঁ, কতদিন খদ্দের না জুটলে আমাকেই দালালি করতে ডেকেছে পরে।"

আরও হয়তো কিছু বলত শশী। বাধা পড়ল একটা মোটা মেয়ে-লোকের চিৎকারে।

"অ পুরুত, তুমি এখেনে মুখপোড়া, উদিকে আমি তিভোবন খুঁজে খুঁজে হয়রান!"

শশী একটু হেসে বলল, "বর্ষার দিন একটু চানকে নিচ্ছি। তা তোমার দরকারটা কী ? পারিশ্চিত্তির করাবে নাকি ?"

"আ মরণ, আমি পারিচিত্তির করাব কোন্ দুঃখে! পারিচিত্তির

করাবে মটরী। যাও একটু শিগগির করে, ও না-খেয়ে বসে আছে তোমার পিত্যেশে।”

থর থর করে উঠল মাসীটা।

“কেন, মটোরের কী হল আবার ?”

“কী আবার হবে গো ? ওর সেই মোছলমান বাবুটা এইছিল না কাল রাত্তে, তাই। ওর আবার যা ছুঁচিবাই ! খদ্দেরেরও জাত দেখে ! মরণ ! কথায় বলে খদ্দের না লক্কী।”

গড়গড় করে আরও হয়তো বলত কিছু, শশী উঠে পড়াতে থেমে গেল।

শশী ম্লান হেসে বলল, “আচ্ছা, যাই তবে, কাজটা সেরেই আসি। ও সা-মশাই, দামটা আমি দোব।”

আমিও উঠে পড়লাম।

নামতে নামতে শশী ফিস্‌ফিস্ করে বলল, “সৈরভীর দিনকাল বড় মন্দা যাচ্ছে। খিটখিটে হয়ে পড়েছে। যাবেন একদিন। খুশী হবে। আপনার ’পর ওর একটু মায়া পড়েছিল। আচ্ছা, যাই।”

ম্লান হেসে শশী চলে গেল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আর শশীর পাত্তা করতে পারি নি। একদিন দুপুরবেলা। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট দিয়ে আসছি, সৈরভীর বাড়িটার কাছে এসেই কী মনে হল ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ঢুকেই বুঝলাম, সে বাড়ি আর নেই। এদিক ওদিক চাইতেই একটা ঘরের ভেতর থেকে গামছা পরে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কারে চাই ?” কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান।

বললাম, “বিশেষ কাউকে নয়, আমার এক বন্ধু থাকত, তাই—”

কথাটা কেড়ে নিয়েই বললেন, “বন্ধু, কে বন্ধু ?”

থতমত খেয়ে বললাম, “তার নাম শশী।”

ভদ্রলোক চিন্তা করে বললেন, “হে নামে কেউরে চিনি না।”

“তা হলে বোধ হয় উঠে গেছে। আপনারা কতদিন হল এখানে এসেছেন ?”

আমি জিজ্ঞাসা করি।

"তা মাস পাঁচ ছয় অইবে।" ভদ্রলোক জবাব দেন।

"তা এখানে থাকেন, উৎপাত করে না কেউ। মানে, পাড়াটা তো তেমন সুবিধের নয়।"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বলেন, "হে তো জানি। যাই কোন্‌খানডায়। কইলকাতায় কি বাড়ি মেলে! তবে একডা কম্ম করিয়া রাখছি। বাইরে একডা বিজ্ঞাপন ঝোলাইয়া দিছি—ইহা ভদ্রলোকের বাড়ি।"

আমি পথে নেমে পড়ি। বেরিয়ে যাবার সময় সত্যিই একটা সাইনবোর্ড নজরে পড়ে—সাবধান, কেহ ঢুকিবেন না। ইহা ভদ্রলোকের বাড়ি। এটা যেন একটা জীবন্ত কার্টুন বলে আমার মনে হয়।

দিন দশ-বারো পরে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছিলাম। শর্টকাট করবার জন্য হাড়কাটা গলির মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলাম। হঠাৎ একটা বাড়ি থেকে শশীকে বেরোতে দেখে ডাক দিলাম।

"শশী যে!"

আমাকে দেখেই শশী হেসে ফেলল।

বলল, "সৈরভী এখন এই বাড়িতে থাকে। দেখা করবেন নাকি? তবে দাঁড়ান খবর দিই।"

বলে, আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই শশী ভেতরে ঢুকে গেল। অগত্যা দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিক পরে ফিরে এসে বলল, "দাঁড়ান একটু, ও ডাকলে পরে ভেতরে যাবেন। যা মেজাজ হচ্ছে ওর দিন দিন। বয়েস বাড়বার সাথে সাথে ছ্যাবলাও হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গদোষ বুঝলেন না, ভদ্দরলোকেরা তো আর আসে না এখন। ছোটলোকদের সহবাস করে আর কত ভাল হবে বলুন? দেখলেই বুঝবেন সে জলুস আর নেই। কী একখানা বাঁধুনি ছিল মশাই! যেন টাইট বাঁধাকপি একখান।"

দরজার দিকে চেয়ে আচমকা থেমে গেল শশী।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "দেখুন দেখুন!"

একটা অপরূপ সুন্দর কচি মুখ দরজা দিয়ে উঁকি মেরে শশীকে ইশারায় ডাকল। শশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফাস্‌ করে পরামর্শ করতে লাগল। কিসের ছোঁয়া লেগে শশীর কদাকার মুখটাও যেন সুন্দর হয়ে উঠল।

খানিক পরে শশী আমাকে ডাকল। ওর পেছনে পেছনে বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। উঠোনটা ভয়ানক নোংরা। গাদা-করা উনুনের ছাই, পচা আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, নাড়ি ভুঁড়ি, জল-ভরা-ভরা ডিমের খোলা—সব মিলে একটা শ্বাসরোধী বোটকা নিরেট দুর্গন্ধ। অন্য কোনদিকে বেরোবার পথ না পেয়ে ওত পেতে আছে, অনথা লোক পেলেই তার নাকে ঢুকে পড়ে। তাড়াতাড়ি একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখে সৈরভী এগিয়ে এল। তিন বছর পরে সৈরভীকে দেখলাম। অনেক রোগা হয়ে গেছে। মাথার সামনের দিক থেকে কিছু চুল উঠে কপালটা চওড়া হয়েছে। তবুও সেই সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বিষাদময়ী সৈরভীর রূপটা কেন জানি আমার ভালই লাগল। যৌন কামনা জাগল না, নিছক একটা আনন্দ দিল।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ সৌরভ?"

ওকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছিলাম যখন, তখন ওকে আদর করে এই নামে ডাকতাম। সৈরভীর মুখটা দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুন্দর করে হেসে বলল, "তাহলে তুমি ভোল নি বাবু!"

ওর স্বর দিয়ে খুশি উপছে পড়তে লাগল। ঘরখানা ঝাড়া পোছা পরিষ্কার। ঘরে আর কোন আসবাব নেই। একটা ট্রাঙ্ক আর তক্তা-পোশ। বিছানার ওপর পরিষ্কার এমব্রয়েডারি-করা কাচানো চাদর পাতা।

"জিজ্ঞাসা করলাম, দিনকাল কেমন চলছে?"

"যেমন দেখছ!"

নিস্পৃহ স্বরে যেন জবাবটা দিল।

বললাম, "দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে ভালই।"

"তাহলে ভালই।"

কেমন যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ওর জবাবটা। এদিক ওদিক চাইতেই ওর শাড়িটার দিকে নজর পড়ে গেল।

আপনা থেকেই বলে উঠলাম, "আরে, সেই জাফরানী রঙ! ঠিক বেছে আজ পরেছ তো! দেখি দেখি! আরে, খয়েরি টিপটাও যে আছে! তবে তো তুমিও ভোল নি!"

"তুমি আমার ভালবাসার লোক। আমি ভুলি কী করে? আমাদের যে মুখস্থ করে রাখতে হয় এসব। আর তাই কি ছাই একরকম, হাজার লোকের হাজার রকম শখ, হাজার রকম বায়না, পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। সব মনে রাখতে হয়, টুকিটাকিটা পর্যন্ত। হি-হি-হি-হি।"

কেমন যেন অস্বাভাবিক হাসি হাসতে লাগল। পাকা বেশ্যাদের গলায় কেমন একটা খনখনে ধাতব আওয়াজ হয়। সত্যি সৈরভী ছ্যাবলাই হয়ে গেছে বটে। মনে বড় কষ্ট হতে লাগল।

খানিক পরে শশী ঘরে ঢুকল। হাতে খাবারের প্লেট। পিছনে চায়ের কাপ হাতে করে ঢুকল সেই সুশ্রী মেয়েটি। ছিপছিপে গড়ন, শ্যামবর্ণ, পাতলা ঠোঁট, ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ, ভীরু, সন্ত্রস্ত ভাব, বক্ষ দুটি এখনও পরিপুষ্ট হয় নি। মেয়েটিকে দেখে আমার যেন কেমন মায়া পড়ে গেল। সৈরভীকে জিজ্ঞাসা করতে সে জবাব দিল, ওটি তার পালিতা মেয়ে।

বললাম, "বেশ মেয়েটি, কী নাম ওর?"

বলেই সৈরভীর দিকে চাইলাম, দেখি ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

শশী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বল মা, নাম বল।"

সৈরভী হঠাৎ যেন খেপে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে কড়া স্বরে ওকে আদেশ করল, "যা, হারামজাদী, নচ্ছার, ও ঘরে যা!"

মেয়েটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। শশীও বেরিয়ে গেল।

সৈরভীকে মনে হল যেন রোঁয়া-ওঠা একটা খেঁকি কুকুর। এক মুহূর্তে মনটা খিঁচড়ে গেল।

বললাম, "তুমি তো খুব নিষ্ঠুর।"

সৈরভীর মুখ ব্যঙ্গের হাসিতে ভরে গেল।

ওর সেই কালশিটে-পড়া গালটায় একটা টোল খেল।

তারপর খন খন করে বলল, "ওরে আমার পিরীতের গোঁসাই রে। ছুঁড়ি দেখলেই মন ছুঁক ছুঁক করে, না?"

সৈরভী তো এ-রকম ছিল না। এত নীচ হয়ে গেল কী করে? জবাব না দিয়ে বিছানার চাদরটার দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল এক কোণে লেখা আছে: পারুল।

যে অস্বস্তির মধ্যে আচমকা পড়েছি, তার থেকে রেহাই পাবার জন্য সৈরভীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পারুল কে?"

সৈরভী চমকে উঠে বলল, "তা দিয়ে তোমার দরকার কী?"

বারে বারেই সৈরভী আজকে বড় আঘাত দিচ্ছে। কেন? ছুত্তোর বলে উঠে পড়লাম।

বললাম, "উঠি, তাহলে।" সৈরভী আবার চমকে উঠল।

"সে কী, এরই মধ্যে?"

সঙ্গে সঙ্গে গলা ধরে এল।

"রাগ করলে? মেজাজটা বড় খারাপ, কিছু মনে কোর না মাইরি। কতদিন পরে এলে, তোমাকে আদর করব, না গালই দিলাম শুধু শুধু।"

বলেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

বলল, "পারুল হচ্ছে পাশের বাড়ির একটা মেয়ে, আমার 'ছিক্কেত্তর'। এই বিছানার চাদরটা ওর কাছ থেকে ধার এনেছি। এই শাড়িটাও ওর। এ-সব কিছুই আমার না। আমার আর-কিছু নেই। সব ধার করা। শুধু তোমার জন্য পরেছি এগুলো। জানি তুমি এ-সব ভালবাস, তাই তোমার মন রাখতেই এগুলো ধার করে এনেছি। এই দেখ আমার আসল চেহারা।"

সৈরভী আবার খেপে উঠল। ভাঙা ট্রাঙ্ক খুলে আধময়লা হলদে শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজ বের করে মেঝেতে ফেলতে লাগল। এক টান মেরে বিছানার চাদরটা ছুঁড়ে ফেলল। ময়লা তেলচিটে চিমসে গন্ধওলা একটা বিছানা বেরিয়ে পড়ল। কাঁথাটা ছেঁড়া, অড়হীন বালিশ। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সৈরভী। হঠাৎ এক ধাক্কায় সৈরভী আমাকে অন্য এক জগতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চোখের সামনে দেখলাম এক সাদা হাড়ের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে। ওর উপর বিরক্ত হওয়াও নিষ্ঠুরতা। পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। আমার বুকের ওপর মাথা গুঁজে ও কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিজবিজে অনুভূতিও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

খানিকপরে ও একটু শান্ত হতেই আমি বললাম, "এবার আসি সৈরভ।"

একটু ম্লান হেসে বলল, "আবার আসবে তো? শুনলাম তুমি নাকি পয়সার জন্য আস না। পয়সাকড়ির জন্য কিছু .আটকাবে না। শুধু হাতে আসতে যদি লজ্জা করে, পয়সা দিয়েই এস না হয়। সে আগেকার দিন আর নেই। এখন আমার দর খুব কম।"

একটু বিচিত্র ভাবে হাসল ও। ক্রোধ, বঞ্চনা, বিদ্রূপ সব মিশে ওর মুখখানা একটা বিচিত্র আকার ধারণ করল।

বিড় বিড় করে সে বলতে লাগল, "আমি এখন খুব সস্তা হয়ে গিয়েছি বাবু। আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ যদি না আস। তোমরা মাঝে মাঝে এলে, তোমাদের মত লোক আমার বাবু ছিলে, সেটা অন্য মাগীদের দেখাতে পারি। আর তাতে আমি এই নরক-যন্ত্রণা, এই অভাব সব ভুলে থাকতে পারি।"

আন্তরিক ভাবেই বললাম, "আসব, ঠিক আসব।"

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

দরজার কাছে আসতেই সেই মেয়েটি আমার পায়ের উপর টিপ করে এক প্রণাম করে এক নিশ্বাসে বলে উঠল, "আমার নাম পুষ্প।" বলেই একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এমন সময় শশী আমার পেছনে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ও ওর মাকে বেজায় ভয় করে কিনা, তাই পালিয়ে গেল। এমন সুন্দর মেয়েটাকে হারামজাদী মাগী দু চোখে দেখতে পারে না। কী রকম মা একবার বলুন তো!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "মেয়েটা আসলে কার?"

শশী বলল, "আমাদেরই। পালা-টালা নয়, রীতিমত গভ্ভের সন্তান। বলে কী, পুষেছি! হারামজাদার ছেনালি দেখলে গা জ্বলে। কলকাতায় আসবার দেড় বছর পর ও হয়। হাসপাতালের খাতায় লেখা আছে সব। মাগীটা ওকে দেখতেই পারে না মোটে।"

সেদিন চলে এলাম খুব বিস্মিত হয়েই।

তারপর দু মাস কেটে গেছে। নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে সৈরভীর কথা আর মনে রাখতে পারি নি। যাওয়াও হয় নি অনেক দিন। নতুন একটা দৈনিক কাগজ বার হচ্ছে, তার খাটুনি পড়েছে অত্যধিক। একদিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে এসে অকাতরে ঘুম দিচ্ছি। অনেক রাত্রে কাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। দরজার উপর দড়াম দড়াম আওয়াজ। যেন ভেঙে পড়বে দরজাটা।

সাড়া দিলাম, "কে?"

শুনতে পেলাম পাশের ঘরের মিস্ত্রী মশাইয়ের উত্তেজিত স্বর, "ও মশাই, শিগগিরি দরজাটা খুলুন।"

ওর গলায় একরাশ উৎকণ্ঠা।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই মিস্ত্রী চাপাস্বরে বলল, "পুলিস আপনাকে খুঁজতে এসেছে।"

বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল।

কনেস্টবলটি আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম গোবিন্দচন্দ্র বসাক?"

ঢোঁক গিলে বললাম, "হ্যাঁ, ব্যাপার কী?"

"আপনাকে একবার মুচিপাড়া থানায় আসতে হবে।"

সৈরভী আবার খেপে উঠল। ভাঙা ট্রাঙ্ক খুলে আধময়লা হলদে শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজ বের করে মেঝেতে ফেলতে লাগল। এক টান মেরে বিছানার চাদরটা ছুঁড়ে ফেলল। ময়লা তেলচিটে চিমসে গন্ধওলা একটা বিছানা বেরিয়ে পড়ল। কাঁথাটা ছেঁড়া, অড়হীন বালিশ। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সৈরভী। হঠাৎ এক ধাক্কায় সৈরভী আমাকে অন্য এক জগতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চোখের সামনে দেখলাম এক সাদা হাড়ের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে। ওর উপর বিরক্ত হওয়াও নিষ্ঠুরতা। পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। আমার বুকের ওপর মাথা গুঁজে ও কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিজবিজে অনুভূতিও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

খানিকপরে ও একটু শান্ত হতেই আমি বললাম, "এবার আসি সৈরভ।"

একটু ম্লান হেসে বলল, "আবার আসবে তো? শুনলাম তুমি নাকি পয়সার জন্য আস না। পয়সাকড়ির জন্য কিছু .আটকাবে না। শুধু হাতে আসতে যদি লজ্জা করে, পয়সা দিয়েই এস না হয়। সে আগেকার দিন আর নেই। এখন আমার দর খুব কম।"

একটু বিচিত্র ভাবে হাসল ও। ক্রোধ, বঞ্চনা, বিদ্রূপ সব মিশে ওর মুখখানা একটা বিচিত্র আকার ধারণ করল।

বিড় বিড় করে সে বলতে লাগল, "আমি এখন খুব সস্তা হয়ে গিয়েছি বাবু। আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ যদি না আস। তোমরা মাঝে মাঝে এলে, তোমাদের মত লোক আমার বাবু ছিলে, সেটা অন্য মাগীদের দেখাতে পারি। আর তাতে আমি এই নরক-যন্ত্রণা, এই অভাব সব ভুলে থাকতে পারি।"

আন্তরিক ভাবেই বললাম, "আসব, ঠিক আসব।"

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

দরজার কাছে আসতেই সেই মেয়েটি আমার পায়ের উপর টিপ করে এক প্রণাম করে এক নিশ্বাসে বলে উঠল, "আমার নাম পুষ্প।" বলেই একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এমন সময় শশী আমার পেছনে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ও ওর মাকে বেজায় ভয় করে কিনা, তাই পালিয়ে গেল। এমন সুন্দর মেয়েটাকে হারামজাদী মাগী দু চোখে দেখতে পারে না। কী রকম মা একবার বলুন তো!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "মেয়েটা আসলে কার?"

শশী বলল, "আমাদেরই। পালা-টালা নয়, রীতিমত গভ্ভের সন্তান। বলে কী, পুষেছি! হারামজাদীর ছেনালি দেখলে গা জ্বলে। কলকাতায় আসবার দেড় বছর পর ও হয়। হাসপাতালের খাতায় লেখা আছে সব। মাগীটা ওকে দেখতেই পারে না মোটে।"

সেদিন চলে এলাম খুব বিস্মিত হয়েই।

তারপর দু মাস কেটে গেছে। নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে সৈরভীর কথা আর মনে রাখতে পারি নি। যাওয়াও হয় নি অনেক দিন। নতুন একটা দৈনিক কাগজ বার হচ্ছে, তার খাটুনি পড়েছে অত্যধিক। একদিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে এসে অকাতরে ঘুম দিচ্ছি। অনেক রাত্রে কাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। দরজার উপর দড়াম দড়াম আওয়াজ। যেন ভেঙে পড়বে দরজাটা।

সাড়া দিলাম, "কে?"

শুনতে পেলাম পাশের ঘরের মিস্ত্রী মশাইয়ের উত্তেজিত স্বর, "ও মশাই, শিগগিরি দরজাটা খুলুন।"

ওর গলায় একরাশ উৎকণ্ঠা।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই মিস্ত্রী চাপাস্বরে বলল, "পুলিস আপনাকে খুঁজতে এসেছে।"

বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল।

[illegible] আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম গোবিন্দচন্দ্র বসাক?"

ঢোঁক গিলে বললাম, "হ্যাঁ, ব্যাপার কী?"

"আপনাকে একবার মুচিপাড়া থানায় আসতে হবে।"

"কেন, কী ব্যাপার ?"

"জানি না, থানায় জানবেন।"

একরাশ ভাবনা, চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে থানায় গেলাম।

ও. সি. আমাকে দেখেই বলল, "আরে, গবু, তুই!"

নিতুকে দেখে প্রাণে জল এল। নিতু আমার সহপাঠী ছিল।

ওকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী রে, ব্যাপার কী ?"

আমার ভয় দেখে নিতু হেসে বলল "বোস্ বোস্, ভয় নেই কিছু, ধীরে ধীরে সব বলছি।"

আমি একটু সুস্থির হয়ে বসলাম। ও চা আনাল।

চায়ে দুজনে দু-এক চুমুক দেবার পর নিতু আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুই শশী আচার্যকে চিনিস ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, কী করেছে শশী ?"

নিতু বলল, "খুন করেছে।"

বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। খুন করেছে! শশী খুন করেছে! অমন শান্ত অমায়িক নির্বিরোধ লোক খুন করবে কী ?

"কাকে খুন করেছে ?"

নিতু বলল, "কাকে নয়, কাকে কাকে বল্। একটা নয়, দুটো খুন। সৈরভী নামে এক বেশ্যা আর ব্রজেন আচার্য নামে এক ছোকরাকে। সন্ধ্যেবেলায় খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে যাই এবং সেখানেই রক্তমাখা অবস্থায় ওকে গ্রেপ্তার করি। কিন্তু হাজতে এসে ও চুপ করে থাকে। কিছুতেই জবানবন্দি দেবে না। শেষে অনেক কচলাকচলির পর তোর ঠিকানা দিয়ে বললে, তোকে যদি ওর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে দিই তবে ও জবানবন্দি দেবে। অগত্যা তোকে আনাতে হল। দেখ্ তো, তোকে কী বলে! দেওধর সিং!"

ওর ডাকে একটা কনেস্টবল এল।

"বাবুকে আসামীর কাছে নিয়ে যাও।"

শশী আমাকে দেখেই একগাল ওর স্বভাবসিদ্ধ ম্লান হাসি হাসল।

ভাবলাম, কী গেরো! শেষে এক খুনের মামলায় ফেঁসে গেলাম ?

আর লোক পেল না শশী। শেষে আমাকে ধরে টান। রাগে পিত্তি জ্বলে উঠল আমার।

"বাবু মশাইকে তাহলে ওরা আনল শেষ পর্যন্ত। কি, ঘুমুচ্ছিলেন ?"

ওর প্রশ্নের জবাব ঘাড় নেড়েই দিই, কথা বলি না। অবাক হয়ে যাই ওকে দেখে। এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল ওর উপর দিয়ে অথচ কোথাও একটু পরিবর্তন নেই। না কথাবার্তায় না আচার-ব্যবহারে। সব কিছু কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে থাকে। নিস্তব্ধ রাত্রি, শিক দেওয়া অবরোধের ভেতর শশী পরম নির্বিকারভাবে কথা বলে চলেছে।

"শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেললাম মাগীটাকে।" বলে যেন নিজের মনেই বলে উঠল, "ঠিক করেছি !"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্রজেন আচার্য কে ?"

"ও ব্যাটা ডাহা শয়তান, আমার ভাইপো। রঘু আচায্যির বংশের শেষ সন্তান। ওকেও দিয়েছি সাব্‌ড়ে। ব্যাটা আমার উপরও টেক্কা মারতে চেয়েছিল।"

বলে শশী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর অকস্মাৎ উত্তেজিত ভাবে শুরু করল, "কেন খুন করেছি জানেন ? মাগী পুষ্পকেও নিজের পথে নামাতে যাচ্ছিল। বোজেনকে এনেছিল, ওর সঙ্গে পুষ্পর আজ বিয়ে দিয়ে সাবিত্তি ভাঙবে বলে। মনে মনে আঁচ করেছিলাম বহুদিন। কত বুঝিয়েছি, নিজে তো ডুবলি সারাজীবন। আবার মেয়েটাকে নরকে ডুবোবার চেষ্টা কেন ? কিন্তু চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী। ওর কী জিদ্ চাপল, মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা করাবেই। আরে আমি বাপ হয়ে যেটা বুঝি, তুই মা, তোর প্রাণে সেটা ধরে না। ও যখন হয়, তখন তো আমরা স্বোয়ামী আর ইস্তিরি হিসাবেই ছিলাম। তবে ? বুঝলেন না, এ ওর সেই পোতিশোধ নেওয়া ছাড়া কিছুই না। ওকে বেবুশ্যি বানিয়েছিলাম, সেই রাগ। তারই শোধ নেওয়া আর কি ? কিন্তু আমার মত পাপীরও মন গলে গেল মশাই, মেয়েটার মুখ চেয়ে। হাজার হোক

বাপ তো বটি, ওর ধম্ম রক্ষে আমাকেই তো করতে হবে। ওর ধম্ম বাঁচিয়ে দিলাম শেষ পর্যন্ত। মেরেই ফেলতে হল খানকি বজ্জাতটাকে। কি আর করা যায়।"

শশী অম্লানবদনে বলে যেতে লাগল। এই জন্ম-পাষণ্ড লোকটার মনুষ্যত্ব আছে? কোমল হৃদয়বৃত্তি আছে? অবাক হয়ে গেলাম মানুষের সীমাহীনরূপ দেখে।

শশী বলতে লাগল, "ক-দিন ছিলাম না এখানে। এক জমিদারের বাগান বাড়িতে কিছু মাল যোগান দিতে বরানগর গিয়েছিলাম। আজ ফিরে দেখি, ভাগ্যিস ফিরেছিলাম, হুলুস্থুলু ব্যাপার। রামবাগান থেকে আমার ভাইপোকে এনেছে পুরুতগিরি করবার জন্য। শুনলাম ওকেই নাকি উচ্ছুগগু করবে মেয়েটাকে। পুষ্পকে ভয় দেখিয়ে নিমরাজী করিয়েছে। এসেই তো মেয়েটাকে সরিয়ে ফেললাম। তারপর কত বোঝালাম হারামজাদী নচ্ছারটাকে! কিন্তু মাগীটা কাঠ-বেবুশ্যি বনে গিয়েছিল মশাই। ধম্মাধম্ম লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তাই এসব কথা কানেই তুলল না, শুধু এক কথাই বার বার বলতে লাগল, "সেদিনের কথা মনে নেই?" সেই এক কথা। পোতিশোধ নেবে। আমিও মশাই ভেবেই রেখেছিলাম, শুধু কথায় চিঁড়ে না ভিজলে কী করব, তাই মেরেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত।"

এতখানি বলে শশী চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। আমার মুখের ওপর ওর স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখখানা নিবদ্ধ করে রাখল। তারপর আমার দুখানা হাত টেনে নিয়ে চুপ করে ধরে রইল।

"কিন্তু আপনাকে একটা ভার নিতে হবে বাবুমশাই। আর তো কোন শালাকে বিশ্বাস নেই। কেন, জানিনে, আপনাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। সেই জন্যই আপনাকে ডাকা। ওকে যেন আমাদের পাপের বোঝা আর টানতে না হয় সেটা দেখবেন।"

বলে ম্লান হাসল।

"আপনার উপর সৈরভীরও খুব বিশ্বাস ছিল। শুনুন, বলেই ফিস্‌ফিস্ করে একটা ঠিকানা বলল। "ওখান থেকে সকাল হলেই

নিয়ে আসবেন। তারপর চন্দন নগরে আমার এক পিসি থাকে তার বাড়িতে ওকে রেখে আসবেন। পিসির ছেলে পুলে কেউ নেই। পুষ্পকে সে পুষ্যি নেবে। ওকে দয়া করে সেখানে পৌঁছে দেবেন বাবু। পুষ্পর ওপর অনেকের নজর আছে বাবু। কতজন আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে ওকে পাবার জন্য। ওকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। দেবেন তো। কথা দিন।" অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম।

তারপর বললাম, "শশী, তোমার পুষ্পকে আমি পৌঁছে দেব ঠিক মত।

"আঃ বাঁচালেন। আপনি দেবেন আমি জানতাম। আমার মনে হয়েছিল।"

শশীর মুখে হাসি ফুটল।

বলল, "এবার আমাকে দারোগাববুর কাছে নিয়ে চল।"

ওর মুখে চোখে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির একটি হাসি। চোখ দিয়ে ঝর ঝর জলও পড়তে লাগল।

বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "অনেক অন্যায় জীবনে করেছি, কিন্তু যখন কোনও পাপ করি নি বাবুমশাই, সেই দিনে পুষ্প আমাদের ঘরে এসেছে। ওর তো ভাল হবার অধিকার আছে।"

তারপর হঠাৎ প্রশান্ত নির্বিকার মুখটা তুলে বলল, "বিড়ি থাকে তো একটা দিন বাবুমশাই। অনেকক্ষণ নেশা করি নি।"

নতুন এঁড়ের কাঁধে জোয়াল ধরাতে বল, নরোত্তম একদিনে ধরিয়ে দেবে। যতবড় বদমায়েশ ষাঁড়ই হোক না কেন, নরোত্তমের হাতে পড়লে একদিনেই শায়েস্তা। না কি নতুন জমি ভাঙতে হবে? বাঁশগাছের গোড়া উপড়ে ধুলো ধুলো করতে হবে মাটি?

না, তাতেও পরোয়া নেই নরোত্তমের। ওর ভয় নেই। বিতৃষ্ণা নেই। বিরক্তি নেই।

শুধু বিরক্তি ধরে ওর এই সাব রেজেস্ট্রী অফিসটায় এলে। এই সাদা চুন-কাম করা বাড়িটা দেখলে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। এমন ভ্যাজালে-কাজে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় না। এখানে সরল কাজ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এক ঝামেলা সতের ঝামেলায় গিয়ে ঠেকে। দূর দূর! এখানে মানুষ আসে! ফচ্ করে পানের পিক ফেলে নরোত্তম।

তা নরোত্তম এক রাতের পথ পেরিয়ে এসেছে প্রায়। সন্ধ্যের পর খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়িটা জুড়েছিল। বলদ ছুটো নতুন। একেবারে আনকোরা নতুন। ধনেখালির গোহাট থেকে কিনে এনেছে এই দিন ছয়েক হল। ওই প্রথম জোয়াল ওদের। কাজ কি সোজা? কাঁধে জোয়াল, সে আর সাধ করে কে তুলতে চায় বল? আগে দড়ি আর পাছে নড়ি, এ ছুটো যদি জুতসই ব্যবহার করতে পারে তো সব অবাধ্যই সজুত হয়ে আসে। নরোত্তম দড়ি আর নড়ি—এ ছুটোই কাজে লাগাতে পারে ভাল। আজ থেকে এ কাজ করছে? সেই কোন্ ছোট বয়সে ছাঁদন দড়ি হাতে নিয়েছিল সে, পাঁচনের নড়ি হাতে ধরেছিল সে, সে কথা স্পষ্ট করে আজ মনেও করতে পারে না। এখন তার বয়েস কত? সে হিসেবও নরোত্তম জানে না। মা-ই তার বয়েসের হিসেব রাখত। তা সেও গত হয়েছে কম দিন নয়।

সেদিন ধনেখালির হাটে ভটচার্যদের সেজবাবুর ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা। তিনিই পরামর্শ দিলেন, বললেন, "এইবার একটা বিয়ে থা কর নরা। বয়েস তো হল। আর ভগবানের ইচ্ছেয় গুছিয়েও নিয়েছিস কিছু। আর দেরি করিস নি মিছে। ছেলে পিলে না হলে পিণ্ডি খাবি কার হাতে ? গতি যে হবে না নাহলে ?"

বিয়ের কথা নয়, নরোত্তম তার বয়সের কথা জেনে নিল তাঁর কাছ থেকে। বলল, "ছোট্‌ঠাকুর, আমার বয়েসটা কত হল, কত্তি পার ?"

"তা আর পারব না ক্যান্।" ছোট্‌ঠাকুর জবাব দিলেন, "তুই তো আমার ফুলদার বয়েসী। তা ফুলদা মারা গেছেন আজ সাত বছর। আর চৌত্রিশ বছর বয়েসে ফুলদা মারা গেছে। এইবার হিসেব করে গ্যাখ। চৌত্রিশ আর সাত—তাহলে তোর গিয়ে সেই একচল্লিশ বছর দাঁড়াল।

সেই দিনই নরোত্তম জানল তার বয়েস একচল্লিশ। সেই হাট থেকেই এই বলদ দুটো কেনা।

সাব রেজেস্ট্রী অফিসের পুব কোনায় এক বট গাছ। গাছের তলে গাড়িটা রেখেছে নরোত্তম। আর দুদিকের দুই চাকার সঙ্গে নতুন বলদ দুটোকে বেঁধে রেখেছে। কয়েক আঁটি খড় সামনে ধরে দিয়েছে সে, তাই শুয়ে শুয়ে মন্থরভাবে চিবুচ্ছে বলদ দুটো। বেশ বলদ। গাট্টা গোট্টা যেমন, তেমনি সুন্দর দেখতে। পাটকিলে পাটকিলে রং, মধ্যে সাদার ছিট ছিট। তা এতখানি পথ ভালই টেনেছে গাড়ি। কিন্তু বড্ড ছনমনে। তা এখন তো নতুন, নরোত্তম সাব রেজেস্ট্রী অফিসের পিল্লে হেলান দিয়ে বসে ভাবছিল, এখনও ও দুটো আনকোরা নতুন। একটু ছনমনে তো হবেই। ও দুদিনেই সজুত হয়ে যাবে। বেজুতকে সজুত করতে মোটেই দেরি লাগে না নরোত্তমের।

"আরে, এই যে, ও মুহুরীবাবু," মুহুরীবাবুকে দেখেই লাফিয়ে উঠেছে নরোত্তম, "আরে কি হল কন্ দিনি।"

মুহুরীবাবু বললেন, আরে ব্যাটা বোস্ বোস্। এ তো তোর চাষকর্ম্ম

নয়। এ আইন আদালতের ব্যাপার। এতো অধৈর্য হলে চলে। তোর কাজ নিয়েই পড়ে আছি সারাদিন। হাঙ্গাম কি কম। নে, একটা পান খাওয়া তো।

তা আপনি একটা ক্যান্ দশটা পান খান, কিন্তু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি উদ্ধার করেন। দ'য় আপনার। যাতি হবে কদ্দু্র কন্ দিনি।"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, দুটো টাকা দে দিকিনি।" মুহুরীবাবু তাড়াহুড়ো করেন।

নরোত্তম ব্যাজার হল। বিরস মুখে বলল, "আবার টাকা ক্যান্, ঐ যে দিলাম তখন।"

মুহুরীবাবু ধমক লাগান, "যা বলছি কর্, দুটো টাকা দে। যার যা দক্ষিণে তাকে তা দিতে হবে তো। সবাই তো আর আমি নয় রে বাপু, যে সারাদিন ব্যাগার খাটবে। উকিলনামা, পেস্কারনামা, এভিডেবিট, সার্চিং ফি, অনেক কিছু আছে ব্যাপার। দলিল রেজেস্ট্রী করা চাড্ডিখানি ব্যাপার নয়। পাত্তব পাত্রী জোটক মেলানোর থেকেও শক্ত কাজ। এসব ব্যাপারে কিপ্টেমি কোর না নরোত্তম, গভীর জলে পড়ে যাবে।"

কথা না বলে নরোত্তম ট্যাঁক খুলে দুটো টাকা বের করে দিল। যেন দুখানা পাঁজরা বেরিয়ে গেল তার। বেজায় চটে গেল।

টাকা যখন যায় তখন তা কত সহজে চলে যায়, কেমন গোটা গোটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু নরোত্তম জানে টাকা অত সহজে ঘরে ওঠে না। নরোত্তম জানে পয়সা জমে জমে আনি হয়, আনি জমে জমে সিকি হয়, সিকি জমে জমে তবে একটা টাকা হয়। সেই পয়সার এক একটা ঘরে তোলা কি কম কষ্ট! কম মেহনত! দেহের রক্ত জল হয়ে নাকি ঘাম হয়, সেই ঘাম দেহ থেকে মাটিতে ঝরলে, ঝরাতে পারলে তবে মাটি থেকে পয়সা ওঠে। তবে কেন ট্যাঁক থেকে টাকা খসাতে পাঁজরার হাড় মট মট করবে না? টাকা কি মাঙনা মাঙনা আসে?

নরোত্তম এসেছে ভোর ভোর; আর এখন দুপুর গড়িয়ে বেলা যে

ঢলে পড়ল তবু কাজ মিটল না। দূর দূর, এসব জায়গায় মানুষ আসে! থুঃ! থুথু ফেলল নরোত্তম বিরক্তিভরে। বলদ দুটোর খড় ফুরিয়ে গেছে। দু আঁটি খড় দিয়ে এল তাদের মুখে। তারপর অফিসের বারান্দায় এসে একটা পিল্লে হেলান দিয়ে বসল। ভাদুরের রোদ লেগে ঘামাচি চিটপিট শুরু হল। পাচন নড়ির ডগা দিয়ে পিঠের ঘামাচি সে খানিক খস খস করে চুলকে নিল। আঃ, একটু আরাম পেল নরোত্তম। চোখ দুটো বুজে এল তার।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই "হ্যাঁগো বাছা", বলে কে যেন এসে দাঁড়াল সামনে। যন্ত্রণা! নিশ্চয়ই সেই ভিখিরী মাগীটা! কিন্তু চোখ মেলতেই নরোত্তমের বিরক্তি জল হয়ে গেল। ভিখিরী বুড়ী নয়, অন্য এক বুড়ী আর পেছনেই আর একটি মেয়ে, যুবতী। বেশ দেখতে। হঠাৎ নরোত্তমের মন খুশিতে ভরে উঠল।

বুড়ীটা জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁগো বাছা, একটু জল পাওয়া যাবে কুয়োয় ?"

নরোত্তমের কান মাথা কেমন যেন গরম হয়ে উঠল। হঠাৎ জবাব দিতে পারল না।

বুড়ী আবার জিজ্ঞাসা করল, "ওগো ভাল মানুষের বেটা, একটু খাবার জল এখানে কুথায় মিলবে বলতি পার ?"

নবোত্তমের চমক ভাঙল; তাড়াতাড়ি করে জবাব দিল, "জল ? আমার সঙ্গে আস।"

নরোত্তম তাকাতে চায় নি মেয়েটার দিকে, মোটেই চায় নি। কিন্তু নজর তার মেয়েটার উপরই পড়ল আবার। বেশ ছোট্ট খাট্ট মানুষটি। বেশ শক্ত সমর্থ। মেয়েটির নজরও হঠাৎ এক সময় ওর উপর পড়ল পড়তেই নরোত্তম লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে চাইল। কিন্তু তার মুখে একটা বোকা বোকা হাসি।

ততক্ষণে ওরা একটা খাবারের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দোকানটা পেয়ে নরোত্তম বেঁচে গেল।

তাড়াতাড়ি বলল, "ও দোকানী, এটটু জল দিবা খাতি ? এই

এদের ছ্যাও দিন? আর ছ্যাখ, শুধু জল দিয়ে না, মিষ্টি টিষ্টি ছ্যাও কিছু। ওই জিলিপিই ছ্যাও। বেশ গরম গরম।"

বুড়ী তাড়াতাড়ি বলল, "না বাবা, মিষ্টি-টিষ্টি থাক। একটু জলই খাই বরং। তিষ্টায় বুক খা খা করছে।"

নরোত্তম আমতা আমতা করে বলল, "না না, শুধু জল কি খায় নাকি এত বেলায়। দোকানী, ছ্যাও জিলিপিই ছ্যাও।"

দোকানী জিজ্ঞাসা করল, "কত দেব জিলিপি?"

নরোত্তম বলতে যাচ্ছিল চার পয়সার কিন্তু কিছু বলবার আগেই চোখ পড়ল মেয়েটার দিকে। দেখল, সেও চেয়ে আছে নরোত্তমের দিকে। চার পয়সার জিলিপি কিনতে লজ্জা করল তার। এই প্রথমবার।

দমকা হুকুম দিলে, "আনা চারেকর ছ্যাও।"

কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ তো বুক খচ খচ করল না এই বাজে খরচের জন্য। অথচ নরোত্তম বরাবর বাজে খরচকে এড়িয়ে এসেছে। একটা পয়সা ফালতু কাজে ব্যয় হলে তার অন্তরাত্মা গেল গেল রবে আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু আজ? আজ তার এসব কথা মনে রইল না।

ঠোঙা-ভরা জিলিপি মেয়েটার হাতেই তুলে দিল। হাতটা কেঁপেছিল বেজায়। ঠোঙাটা মেয়েটা যদি চেপে না ধরত তো পড়েই যেত মাটিতে। হাতে হাত ঠেকে গেল দু জনের। নরোত্তম আবার কেঁপে উঠল।

মেয়েটা মুচকি হেসে মন্তব্য করল, "হাতে কি তোমার বাতব্যাধি, অত কাঁপে কেন?"

মা ধমক দিল, "তুই থাম তো হরিদাসী।"

মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে বুড়ী বলল, "বেঁচে থাক বাপ আমার। দীর্ঘায়ু পেরমায় হোক। বড় ডবল ধন আমার। দেখ দিকি কী গেরোর ঘোর। জমি বিক্রি করিছি। করে কী ঝঞ্ঝাট! মিনসে টাকা দিলে না, কড়ি দিলে না। চাইলাম তো বলল, চল, কোর্টে চল, ওখেনে দোব, এখানে আ'সে বলে কি, টাকা ভাঙাতে দিইছি। কোর্টবাবু

জিজ্ঞেস করলে বলো, সব টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র দলিল লিখিয়া দিলাম। তখন মেয়ে বলল, তা কেন, টাকা আগে হাতে দাও এনে, ও কথা বলব। তখন বলে, সব টাকা তো আনি নি, এখন অদ্ধেক নাও আর বাড়ি গিয়ে অদ্ধেক দোবো। মেয়ে বলল, খবরদার, ও কথা শুনোনা মা। ওঠক। তাই শুনে মিনসে রেগে আমাদের ফেলে চলে গেল। আসবার সময় ওই আনলে। এখন ছাখ তো বাবা সেই কোন সক্কালে এইছি। বিদেশ বিভুঁই ঠাঁই। এখন বাড়িই বা ফিরি কেমন করে। অলপ্পেয়ে হতচ্ছাড়ার পাল্লায় পড়ে কি হেনস্থা হল, বল দিকি। ফিরে যাবার পয়সা পর্যন্ত দেয় নি।"

বুড়ী ভয়ে, দুর্ভাবনায় কেঁদে ফেলল!

নরোত্তম পট করে বলে ফেলল, "কোন ভয় নেই মা। তুমাদের বাড়ি কনে?"

এবার বুড়ী নয়, মেয়ে জবাব দিল, "রাজার বাথান।"

মেয়ের ভাবসাব দেখে এতক্ষণ নরোত্তমের মনে হচ্ছিল, ও যেন পছন্দ করছে না তাকে। কেমন যেন তফাত থাকতে চাইছে। যেন ওর ছোঁয়া বাঁচিয়ে, থাকতে চাইছে। এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বুড়ীর আর নরোত্তমের মধ্যে। ওসব কথা যেন বুড়ীর আর নরোত্তমের! যেন সে-সবের সঙ্গে মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই। যেন ও অন্য দলের মানুষ। নরোত্তমকে যেন ও চেনেই না। তা অবিশ্যি চেনে না। কিন্তু ভাবখানা এমন দেখাচ্ছিল যে, ওর মাকেও কোনদিন দেখে নি। এই যে মাথার ওপর এতবড় বিপদ, বাড়ি ফেরার পয়সা নেই হাতে, বিদেশ বিভুঁয়ে এনে দুটো অনাথা অবলাকে ফেলে পালিয়ে গেল কোন্ এক ব্যাটা বদমায়েশ, তা সে সবে ভ্রূক্ষেপও নেই মেয়েটার। ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই মেয়েটার মুখে চোখে কোথাও। মা তো এদিকে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। মুখ চোখ সাদা হয়ে গেছে। কথায় কথায় জল ঝরছে চোখ দিয়ে। বিপদটা যেন বুড়ীর একার! নরোত্তম ভাবে, আচ্ছা মেয়ে বটে! ও কি পাষাণে গড়া? ওর দেহে রক্ত মাংস নেই? তাপ উত্তাপ নেই? ওর মন বলে কোনও বস্তু কী ওকে দেন নি ভগবান?

বারে বারেই এসব কথা ভাবছিল নরোত্তম। ভাবছিল আর চাইছিল মেয়েটার দিকে। চাইছিল আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করছিল, ও মুখে কোনও ভাবান্তর মেলে কিনা। ভারী সুন্দর মুখখানা কিন্তু। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছা করে। আবার দেখলে আরেকবার। আরেকবার। হঠাৎ যদি মেয়েটা এদিকে চায়, থতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ নামিয়ে ফেলে। লজ্জা পায়। গলা বুক শুকিয়ে আসে। কিন্তু আবারও যে চাইতে ইচ্ছে করে। এ কী ছেলেমানুষী ইচ্ছে। আরেকটি ইচ্ছেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ওর কথা শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে। কিন্তু ও যে মোটেই কথা কয় না। বোবা নাকি? হাবা নাকি?

"রাজার বাথান।"

রাজার বাথান?

কথা যখন একবার বলেছ, তাহলে দোহাই তোমার, আরও বল। দোহাই তোমার, থেমো না। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুনয় করে নরোত্তম। ব্যাগ্যতা করে। হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে ওর। প্রশ্ন করে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে।

"রাজার বাথান? কোন্ রাজার বাথান? থানা কী? জেলা কী? কোর্ট কাছারি কোথায় কর?"

মেয়েটা শয়তান আছে। ভিজে বেড়ালের মত থাকলে হবে কী? এতগুলো জেরা শুনে মেয়েটা নরোত্তমের দিকে চাইল। গাম্ভীর্য বজায় রেখেই চাইল। কিন্তু নরোত্তম হলফ করে বলতে পারে, ওর ঠোঁটে চাপা হাসি ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু জবাব দিল মুখ গোমড়া করেই। বলল, "অতশত জানি নে বাপু। আমি কি আসামী নাকি যে, জেরার কৈফিয়ত দেবো?"

বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। মা অমনি কট কট করে বকে উঠল, "ওকি হরিদাসী! কথাবার্তার ছিরি দেখ না। গা একেবারে জ্বলে-পুড়ে যায় বাছা।"

মেয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, অমনি মুহুরীবাবু ঢুকতে চুপ মেরে

গেল। নরোত্তম খুব চটে গেল। আর সময় পেলে না আসবার?

মুহুরীবাবু নরোত্তমকে দেখেই বলে উঠলেন, "এই যে ব্যাটা, তুই এখানে? আর আমি দলিল নিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তা এরা কে?"

নরোত্তম চটে উঠল। বলল, "তা দিয়ে তুমার কি প্রয়োজন বলেন তো। দলিল এনেছেন দিয়ে ছ্যান, ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা।

নরোত্তমের কথা শুনে মুহুরীবাবুর তাক লেগে গেল। ঢোঁড়া সাপ ছোবল মারে যে, অ্যাঁ!

মুহুরীবাবুও চটে গেলেন। বললেন, "ফি-টা দাও দিকিনি, তবে তো দলিল?"

"কত, লাগবে কত?" নরোত্তম জিজ্ঞাসা করে।

মুহুরীবাবু বলেন, "তা আমার উপর যখন ভার দিয়েছিস, বেশী কি আর খরচ করতে দিই। দে ব্যাটা দুটো টাকা।"

নরোত্তম ফস করে দুটো টাকা মুহুরীর হাতে দিয়ে, কথাটি না কয়ে দলিলটি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে গাড়ির মধ্যে থেকে পিরেন বের করে তার পকেটে রেখে দিল। তারপর বলদ দুটো গাড়ির কাছে এনে বলল, "নাও গো ওঠো সব গাড়ির মদ্যি। আমার বাড়িও হাট বসন্তপুর। তুমাদের ওই দিকেই। আমিই পৌঁছয়ে দিবেনে। চল।"

মুহুরীবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অ্যাঁ, দু-দুটো টাকা ফস করে দিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল না। খ্যাঁচাখেঁচি করল না। বলা মাত্র দিয়ে দিল! ওর আজ হল কী?

শহরের মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়ল এক হোটেল। এক 'পবিত্র ভোজনালয়।' দেখামাত্র হু হু করে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। নরোত্তমের পেটের ক্ষিধে চন চন করে উঠল। নিজের খাওয়ার চেয়েও আর একজনকে খাওয়ানোর ক্ষিধেটাই প্রবল হয়ে দেখা দিল।

নরোত্তম বলদ দুটোর রাশ টেনে বলল, "আসো না গো মা, দুটো ভাত খায়ে নিই।"

বুড়ী বলল, "না বাবা আর কেন? অনেক তো খালাম। তাছাড়া এখন খাওয়া আমার তো অব্যেস নেই।"

নরোত্তমের সব উৎসাহ জল হয়ে গেল। কাতর চোখে চাইল হরিদাসীর দিকে। সে চাউনিতে কী ছিল তা হরিদাসীই জানে। হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলল, "মা তবে তুই থাক্‌, আমি চাড্ডে খেয়ে নেই। সারাদিন পেটে ভাত পড়ে নি গো।"

মেয়ের এই বেহায়াপনা দেখে মায়ের লজ্জা হল; ধমক দিল মেয়েকে, "ছি ছি. লজ্জা নেই তোর।"

হরিদাসী হেসে উঠল। নরোত্তমের দিকে এক নজর চেয়ে বলল, "আপন জনের কাছে, আবার লজ্জা কী?"

এই একটা কথায় নরোত্তম হালকা তুলো হয়ে গেল যেন। উড়ে বেড়াতে লাগল ফুরফুরে বাতাসে।

এই হাল্কা হাল্কা ভাব, মন রাঙানো আবেশ নরোত্তমকে আচ্ছন্ন করে রইল তখনও, যখন হরিদাসী নেই তার গাড়ির মধ্যে, অথচ আছে। ওদের পৌঁছে দিয়ে, সে-বেলা হরিদাসীদের বাড়িতে সেবা যত্ন খেয়ে, ওদের গ্রামে আবার যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন ফিরছিল নরোত্তম তার নিজের গ্রামে, সেই ফেরার মুখে সারাটা পথ, সারাটা সময় শুধু হরিদাসীর ভাবনা ভাবল। ওকে হাসলে ভাল দেখায়, পান দিতে এসে নরোত্তমের সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাসল হরিদাসী, কত সুন্দর দেখাল তাকে। ওকে রাগলে ভাল দেখায়, কী কথায় কথায় ও-র মায়ের সঙ্গে যখন ঝগড়া বেধে গেল, তখন তার সেই কুপিত মুখখানা কী সুন্দর লাগছিল! আর নরোত্তমের বিদায়ের কালে যে কান্না-চাপা থমথম মুখখানা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দেখছিল নরোত্তম, তাও সুন্দর, খুবই সুন্দর।

এখন কথা হচ্ছে কোন্‌ মুখখানা দেখতে সব থেকে ভাল? হাসি-হাসি না রাগ না কান্না-কান্না? এইবার নরোত্তম বিপদে পড়ল

একটু। এই তো হরিদাসীর তিনটে মুখই তোমার সামনে এনে রাখা হল, ছাখ ভাল করে, মিলিয়ে নাও। আরে হ হ হ হাটে সম্বন্ধীর গোরু, পথ দেখে চলতে পার না? উঃ, খুব বাঁচা আজ বেঁচে গেছে নরোত্তম!

"বাঁ বাঁ, বাঁয়ে যাব না ক্যান। চোকি কি পথ ঢোকছে না, অ্যাঁ।

উঃ ডানদিকে আর একটুখানি এগুলেই হয়েছিল আর কি? ওই নয়ানজুলিতে গাড়ি উল্টোলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না নরোত্তমকে।

কী হত তাহলে? সে মরেই যেত যদি কী ক্ষতি হত কার? কে তার জন্য চোখের জল ফেলত? কে আছে তার? হঠাৎ নরোত্তমের মনে হল, তাইতো, তার কেউ তো নেই। সামনে পিছনে আশে পাশে তাকালে নরোত্তম, কিন্তু কাউকে তার মনে পড়ল না। বাবাকে সে মনেই করতে পারে না। তার থাকবার মধ্যে ছিল মা। মাকে তার মনে পড়ে। কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। কবে মারা গিয়েছে। তখন কী তুঃসময় নরোত্তমের।

আজ তো নরোত্তম গ্রামের মধ্যে দস্তুরমত গণ্যমান্য লোক। জমি, গরু, ধান, বাড়ি, নগদ টাকা সবই তার হয়েছে। যা চেয়েছিল তা পেয়েছে নরোত্তম। পেয়েছে নয়, অর্জন করেছে

## দুই

কে ছিল নরোত্তম সেদিন, যে দিন ওর মা হরি ভট্টচাযের বাড়ি ওকে প্রথম নিয়ে এল। এই এতোটুকুন একটা ঘুনসি শুধু, বাস্, আর কিছু না! কত আর হবে বয়েস? ছ সাত বছর। তখন নরোত্তম নয়, নরা।

হরি ভট্টচাযের ছুটো মরখুণ্ডে গোরু নিয়ে নরার বাগ-রাখালি শুরু। সেই তার মাঠে বেরুবার হাতেখড়ি। মা সেই বাড়িতেই ঝি-য়ের কাজ করত। বদলে মায়ে পোয়ে পেত দু বেলা খেতে। বাস্, আর কিছু না। কিন্তু তখন সেই তো স্বর্গ।

সেই হাড় ডিগডিগে গোরু ছুটোর হাল নরার হাতে পড়ে ফিরে গেল। পাঁজরার হাড় তলিয়ে গেল নধর দেহের মধ্যে। চেকনাই ছাড়তে লাগল। দুধ দিতে লাগল। বিয়েন দিল। কিন্তু যে নরা সে নরাই রয়ে গেল। গোরু দুধ দেয়; সেই দুধ ভোগে লাগে, তাই গোরুর দিকেই ভট্টচাযের খর নজর। রাখালের বাঁটে দুধ থাকে না, তাই কে পোঁছে তাকে।

যাক, তার জন্যে নরার দুঃখ নেই, আফসোস নেই। কাজটা তার ভাল লাগে। কাজ করেই সে খুশী। গোরু নিয়ে এ মাঠ সে মাঠ ঘোরায় বড় আনন্দ পায় সে। হাঁটতে বড় সুখ লাগে তার, শুধু হাঁটার আনন্দেই নরা কতদিন যে কত গ্রাম, কত মাঠ ঘুরে বেরিয়েছে গোরু নিয়ে নিয়ে তার ইয়ত্তা নেই।

রাখালিই সে করবে, করতে চায়। তবে এই বাগ-রাখালি আর নয়। নরা এবার বাথানের রাখাল হতে চায়। গেল শীতে গোরু মোষের বাথান পড়েছিল তাদের গাঁয়ের উত্তরে। সেই থেকে খুচরো কাজে অরুচি ধরেছে তার। এক বাথানে কত গোরু কত মোষ, কত ভেড়া, কত ছাগল। বাপ্ রে! আর কী সুখ রাখালদের। বাড়ি

যেতে হয় না, ঘরে যেতে হয় না, মাঠে মাঠে শুয়ে থাকে, রাঁধো, বাড়ো, খাও। কী মজা!

কিন্তু বাথানের রাখাল হওয়ার সাধ নরার আর ইহজন্মে মিটল না। এদিকে বাগ-রাখালি যায় যায়। নরা দুধ চুরি করে খায়, ভট্‌চাযরা কি করে জেনে গেল।

কায়দাটা নরা কিন্তু জানত না। ওকে শেখাল দেওয়ান-বাড়ির রাখাল বিন্দাবন।

ভট্‌চাযদের গাই নতুন বিয়েন দিয়েছে। নরার কি আনন্দ! বাছুরটাকে লালঝোল সমেতই বুকে চেপে ধরল। আদর করে বাছুরটার মুখে ওর মায়ের বাঁট পুরে দিল। এক মাস পার না হলে ভট্‌চাযরা সে গরুর দুধ খায় না, 'হাকড়া' দুধ বুড়োরাজের মাথায় ঢালে। মাস পুরলে একদিন ওই দুধের ক্ষীর করে গোক্ষুরনাথের নাড়ু তৈরী হবে। সেই নাড়ু খাওয়ার পর দুধ উঠবে ঘরে। ততদিন গোরুর দুধ বুড়োরাজের মাথায় পড়ে, বাছুরে খায়। তবু পালানে দুধ থৈ থৈ করে।

বিন্দাবন তাই দেখে। তারপর একদিন নরার গায়ে এক ঠ্যালা মেরে বলে, "তুই শালা এক নিরেট উজবুক। পালান বায়ে অত দুধ গড়ায়ে পড়ে আর তুই হাঁ করে দেখিস। ক্যান্, খাতি পারিস নে?"

নরা অবাক হয়। কী রকম কথা?

জিজ্ঞাসা করে, "বিন্দেদা কও কি গো। দুধ থাকল গোরুর বাঁটে, তা আমার গলায় ওঠবে কি করে?"

বিন্দাবন হাসে, বলে, "ওঠবে কি অমনি অমনি? বাঁটে মুখ লাগারে শালা।"

নরার চোখ চুকচুক করে ওঠে, তাই তো, এ-কথাটা তো কোনদিন মনে হয় নি তার। তবু ভয় একেবারে যায় না।

"চাঁটায় যদি?"

বিন্দাবন ঠাট্টা করে, "এতদিন তুই গোরু চরালি না, গরু তোকে চরাল? অ্যাঁ। এই দু বছর ধরে যদি গোরুর বাঁটই না চুষলি

তো রাখালি করে শিখলি কী? জিব দিয়ে বাঁট চোষেক, দেখিস, তাতে গরুর আরাম হয়, কিন্তু খবরদার, বাঁটে যেন দাঁত ঠেকে না, তালি লাথির চোটে দেবেনে বদন বিগড়ে।"

তারপর থেকে নরা দুধ খেতে শুরু করেছে। রোজই খায়, কিছু কিছু। বাঁশের চোঙায় পুরে মধ্যে মধ্যে মায়ের জন্যেও আনে। কিন্তু একদিন কেমন করে যেন বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেল। কার লাগানি ভাঙানিতে কে জানে? ভট্‌চাযদের সেজবাবু খুব বদরাগী লোক। এককালে ছোট-দারোগা ছিলেন। নরাকে ধরে একেবারে চোরের মার দিলেন। পরদিন থেকে নরা আর এল না।

ভট্‌চায বাড়ির কাজ গেল তো বড় বয়েই গেল। রাখালিতে কিছু নাম হয়েছে নরার। ওর কি কাজের অভাব! বিশ্বাসরা বহাল করলেন ওকে। তা ভালই হল, বিশ্বাসদের গাই বাছুরে দু গণ্ডা দু বেলা খাবে নরা, আট আনা মাইনে পাবে মাসে আর বছরে একখানা গামছা। এ যে নরার স্বপ্নাতীত। নরাকে আর পায় কে? মাঠের আগল বাগল নরার মত জানে কে? দু দিনে চেকনাতে লাগল গোরু।

বেশ চলছিল। গোল গণ্ডগোল কোথাও ছিল না। বছর ঘুরে বছর পড়েছে। দু গণ্ডা গাই বাছুর আড়াই গণ্ডা হয়েছে। একখানা লাল গামছা মাথায় উঠেছে নরার। ওর জীবনে এই প্রথম নতুন সুতো গায়ে ঠেকাল সে। প্রথম দিন কেমন মাড় মাড় গন্ধ লেগেছিল। জলে ভিজিয়ে আবার আরেক গন্ধ পাওয়া গেল। নরা গামছাখানা নিয়ে কী যে করবে প্রথম দিন তা ভেবেই পেল না। শুধু গামছাই নয়, বিশ্বাসরা এক-টুকরো পুরানো কাপড়ও দিয়েছে, আর একটা খাটো কোট। যত ইচ্ছে দুধ খেয়েছে নরা। তিনটে দোয়া গাই। তাই বছরের কোন সময়েই বাদ পড়ে নি দুধ খাওয়া। কর্তারাও বাদ সাধেন নি। আর কী চাই নরার। রাখালি-জীবনের পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটেছে।

কিন্তু তবুও এক অস্বস্তি কিছুদিনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

রাখালি বিস্বাদ ঠেকল। দুধের সোয়াদে আর মন ভরে না এখন, মাটির আস্বাদ চাই।

বিলের মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিল সেদিন। সামনের মাঠে মই দিচ্ছিল রামকিষ্টো। ভারী মজা লাগল নরার। এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। ঢ্যালা ঢ্যালা ভুঁইয়ের উপর দিয়ে সড়্‌সড়্‌ করে চলে যাচ্ছে মইখানা। উপরে রামকিষ্টো গরুর লেজ ধরে খাড়া। পিছনের মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো ধুলো হয়ে যাচ্ছে। গাড়াগর্ত বুজে গিয়ে, উঁচু মাটি মাথা নুইয়ে সমান হয়ে যাচ্ছে। নরোত্তমের মনে হল, আহা, ওটা যেন মাটির সরোবর, আর লম্বা লম্বা সোজা মইয়ের দাগ-গুলো যেন ঢেউ। পা দুটো নিশপিশ করতে লাগল তার। সারা দেহে জাগল কিসের ক্ষুধা। মনে হল এই তার কাজ। এ না করলে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল রামকিষ্টোর।

বলল, "রামকিষ্টো কাকা, আমাকে একটু দিবা মই চড়তি?"

"তুমি কি এসব পারবা বাপ? ছেলেমানুষ, পড়ে-টড়ে হাত পা ভাঙবা।"

"খুব পারব কাকা, দিয়েই ছাখ।"

"তালি একটু তামাক সাজ। আমি এই পাকটা ঘুরে নিই।"

নরা মন দিয়ে তামাক সাজল। রামকিষ্টো বুঝিয়ে সুজিয়ে দাঁড় করাল ওকে মইয়ে। প্রথম প্রথম কি পারে? টলে টলে পড়ে। টাল রাখতে হিমসিম খায়। কী উত্তেজনা! পাক দুয়েক শুধু ভয় ভয়। শরীরের টলানি ভাঙতে যা দেরি, টাল রাখা রপ্ত করতে যতটুকু অপেক্ষা। তারপর রামকিষ্টোই অবাক হল। সারা মাঠ মই দাবড়াল অক্লেশে। অ্যাঁ, না, ছোঁড়াটার এলেম আছে।

গরু ছেড়ে দিয়ে নরা রোজই নতুন খেলায় মাতে। তামাক সাজে খুব আয়েস করে। দু-এক টান দিয়ে রামকিষ্টোর হাতে কলকেটা তুলে দেয়।

বলে, "কাকা তুমি এট্টু জিরাও, ইবার কপাক আমি ঘুরি।"

গিয়ে লাঙলের মুঠো চেপে ধরে। পড়পড় করে মাটি ছিঁড়ে যায়। নরার রক্তে চঞ্চলতা জাগে। হাতের তেলো খরখরে হয়ে ওঠে। মাংসপেশী হয় দড়। পাঁচনবাড়ি নিতে আর মন চায় না।

বড় বিশ্বাসকে গিয়ে বলে, "কত্তা, ছুটি দ্যাও।"

"ক্যান, ছুটি ক্যান?"

কত্তার রকমসকম দেখে নরা ভড়কে যায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

"কী গো বাবু কথা নেই যে মুখি?"

বুধো ভুয়ে বড় কত্তার বন্ধু লোক।

জিজ্ঞাসা করল. "কী ব্যাপার?"

"বাবু ছুটি চান।"

"ক্যান, বিয়ে করবে?"

"আরে, বলছে কই?

নরা সামলে নিয়ে বলে, "রাখালি আর করব না।"

এবার কত্তা আকাশ থেকে পড়েন। বুধো ফোড়ন কাটে।

"কী করবা তালি? দারোগাগিরি?"

"না, লাঙল চষব।"

বড় কত্তা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

"তাই বল। হারামজাদার কথার ধরনটা দ্যাখ দিনি একবার। লাঙল চষবা, চষ।"

নরা খুব খুশী হয়ে ওঠে। বড় কত্তা বলেন, "সকালে রামকিষ্টোর সঙ্গে বেরোয়ে যায়ো। আর বিকেলে আসে গরু চরাতি যাবা বুঝলে?"

"তা মাইনেটা একটু বিবেচনা কল্লি হতো না," নরা আমতা আমতা করে।

"মাইনে যা পাচ্ছ তাই পাবা।"

"ক্যান, ছুডো কাজ করব, মাইনে বেশী পাব না?"

কত্তা মুচকি মুচকি হেসে বলেন, "ছুডো কাজ করতি তোমারে দিব্যি দেচ্ছে কেডা?"

নরা তবু গাঁইগুঁই করে। বলে, "বাঃ, কিছু বেশী—"

কত্তা ধমক দিয়ে ওঠেন, "সুমুন্দির বড্ড ত্যালাল হয়েছে দেখি। তোর মা যে গত বছর আটটা টাকা ধার নিইছিলো সিডা আগে শোধ কর্। তারপর তোর মাইনে বাড়াবো। তার ছু টাকা সুদও যে হয়েছে।"

নরা আর কথা বলে না। মুখ চুন করে চলে যায়। এই প্যাঁচেই বিশ্বাসরা তাকে গোলাম করে রেখেছে, কাটাবার মন্তর সে জানে না।

বড় কত্তার শখ চাপল ছাগল পোষবার। পাঁচটা মাদী আর ছুটো পাঁঠা কিনলেন। এমন পাজী জানোয়ার আর ছুটো নেই। সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাখালির উপর নরা হাড়ে চটে গেল। বুঝল, বিশ্বাস-বাড়িতে থাকলে রাখালি ঘুচবে না। টাকা শোধ না দিলে মুক্তিই বা কই? তবে সারা জন্ম যাবে পাঁচনবাড়ি হাতে গাই ছাগল চরিয়ে? জমির স্পর্শ গায়ে লাগবে না? পাওয়া যাবে না পাকা ফসলের আঘ্রাণ? নরা পয়সা জমাতে শুরু করল। কিন্তু মাস মাইনে আট গণ্ডা পয়সা. এক বছরে জমবে বড় জোর ছ টাকা। ওদিকে কত্তাদের দেনা বেড়েই চলবে। সুদ বাড়বে ছাগলছানার হারে।

রামকিষ্টো বলল, "বড় শক্ত ব্যাপার বাবা। ছুপোরে জন খাটবা?"

"একটা উপায় করে দাও খুড়ো।" নরা কাতর হয়ে বলে।

"দাঁড়াও বাপ, সোমায় আসুক।"

রামকিষ্টো ঘরামীর কাজ করে। এবারে নরার বাপের কাজ করল। ঘর ছাইতে ডাক পড়ে আর নরাকে জোগানে করে সঙ্গে নেয়। এই উদ্যমী ছোট ছেলেটির চোখে দূরাগত কিসের যেন সে ছবি দেখতে পেয়েছে। ঘরামীর কাজ শিখে ফেলল নরা। শিখল ভালই। বিশ্রামকে তালাক দিল। পয়সা জমাতে লাগল। ছেলের অসুখে যে টাকা ধার করেছিল মা, তা যে শিকল হয়ে ছেলের পায়ে বেড়ি দিয়েছে, নরার মা কী তা জানে? ছেলে ক্ষেপে গেল সেই শিকলকাটার সাধনায়। একটা একটা করে টাকা জমে। টাকাগুলো একটা একটা করে বাড়ে আর নরার চোখ চকচক করে। আর ক-দিন আর কটা দিন।

পাশের গ্রামে ঘর ছাইতে গিয়েছিল। ফিরতে বেলা গড়িয়ে পড়ল। কত্তারা আজ রেগে টং হয়ে যাবে। যাক গে। আর এই হপ্তাটা। নরার শরীর মুক্তির সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে কাঁপতে থাকে। আর এই কটা দিন। তারপরে বিশ্বাসদের হাতে মুক্তিপণ গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। নরা তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরল। আরে, মা কই? কোথায় গেল? ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখল, মা কাঁথামুড়ি দিয়ে কাঁপছে। কদিন থেকে জ্বরে ভুগছে বুড়ী। তাই নিয়েই কাজকর্ম করে। বললে কথা শোনে না। চিকিৎসা করাতে বললে রাজী হয় না। বেশী বলতেও সাহস পায় না নরা। শেষ পর্যন্ত যদি ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হয়! যদি টাকা খরচা হয়! সর্বনাশ! একটা টাকার থেকে একটা পয়সা খসবে সে কথা ভাবতেও নরা পাগল হয়ে যায়, মনে মনে বলে এমন শক্ত ব্যাধি কিছুই হয় নি মার, যার জন্যে ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হবে। মা সে কথা বোঝে। বলে, "ভাবিস্ নে বাপ, ভাল হয়ে যাবানে। পুরনো তেঁতুল এট্টু যুগাড় করিস তো। তা খালিই জ্বর ছাড়ে যাবেনে।"

নরা আশ্বস্ত হয়ে কাজে যায়। কিন্তু পুরনো তেঁতুলটুকুও আর যোগাড় হয়ে ওঠে না। অনেক রাত্রে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লে নরা টাকার হাঁড়িটা টেনে নামায়। আর একটা একটা করে গোনে। মা খকখক করে কাশে। ঘুমতে পারে না বুড়ী। খুব কাশে। হাঁফায়। নরা সেদিকে একবার তাকায়। মায়ের কষ্ট দেখে কষ্ট পায়। কিন্তু মনের অজ্ঞাতসারেই হাঁড়িটা লুকিয়ে ফেলতে যায়। যেন মায়ের এই অসুখ ষড়যন্ত্র করে ওর টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে এসেছে। কিন্তু না না, এর থেকে একটি পয়সা সে কাউকে দিতে পারবে না; সন্তর্পণে হাঁড়িটা রেখে মায়ের কাছে ফিরে আসে। বুক ডলে দেয়। গা হাত পা টিপে দেয়। প্রাণপণে সেবা করে তার। গতর দিয়ে যতটুকু পারে তার কসুর করে না নরা।

এদিকে মায়ের অসুখ কমবার লক্ষণ নেই। কাজে বের হবার সময় মার কাছে এগিয়ে যায়।

ভয়ে ভয়ে বলে, "মা ডাক্তার তালি কি ডাকব ?"

মা জবাব দেয় না। ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। নরার বুক ঢিপ-ঢিপ করে। যদি হাঁ বলে বুড়ী।

মা বলে, "ভাবিস নে বাবা। ভাল হয়ে যাবানে। একটু পুরনো তেঁতুল যুগাড় করে আনিস।"

শুনে স্বস্তির শ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে পড়ে।

কাজকর্ম সারা করে হাত ধুয়ে রামকিষ্টোর পাশে এসে দাঁড়ায় নরা। মজুরি নেবার সময় বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। টাকা যদি না পায়, একটা পয়সা যদি শেষ পর্যন্ত না দেয়। না, পেল টাকা। পেয়ে তবে স্বস্তি।

রামকিষ্ট বলে, "হ্যা বাপ, টাকা দেখে নিয়েছ তো ?"

নরা জবাব দিয়েই ছুট মারে। একদলা পুরনো তেঁতুল হাতের মুঠোয় ধরে মাঠ ভেঙে দেয় ছুট। কাল সকালে বুড়ো বিশ্বাসের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে মুক্তি। মুক্তি পাবে সে। যোগাড় হয়েছে সব টাকা। রাখালি আর নয়, এবার থেকে হালুটি। হাল ধরবে, বিদে চালাবে, মই দেবে মাঠে। নরা বাড়ি ফিরে দেখে বুড়ী ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। ঘরের খুঁটি কাটা। হাত-দা, আর খুচরো পয়সা কতকগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে।

নরা ডাকল, "ও মা, ওখেনে অমন করে বসে আছিস ক্যান্, ওঠ্। কেমন আছিস ? এই নে তোর তেঁতুল। এ পয়সা কার ?"

গায়ে হাত ঠেকাতেই বুড়ী গড়িয়ে পড়ে গেল খুচরো পয়সাগুলোর উপর। কচকচ শব্দ করে উঠল রেজগিগুলো। বুড়ীর দেহ ঠাণ্ডা। হাত পা সব শক্ত কাঠ হয়ে গেছে।

নরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লাঙল ধরলে আর ছাড়তে চায় না নরোত্তম, গরু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বেছে বেছে তাগড়াই মোষ নিয়েছে একজোড়া। সে মোষজোড়াও ক্লান্ত হয়, কিন্তু নরোত্তমের ক্লান্তি নেই। আশেপাশের হালুটিরা কখন

বসে পড়েছে। নরোত্তম কিন্তু ঘুরে চলেছে হালদার-গিন্নীর জমিতে, হালদার-গিন্নীর জমিটুকু শেষ হলে বোসদের সেজ-বউয়ের দু দাগ। এ বছরকার মত এই। সামনের বার দেখা যাবে আর ক'দাগ বাড়ানো যায় কি না; নরোত্তম শুধু বিধবাদের জমিই বর্গা নেয়; বয়েস কম বলে গিন্নীরা ওকে স্নেহ করেন। তার উপর অক্লান্ত খাটতে পারে বলে ফলনও বেশী হয়। তাই মালিকেরা ওর উপরে খুশী। সর্বদা ওকেই ডাকেন। আর একটা গূঢ় কারণ আছে সেটা—নরোত্তমের গোপন। একটু আধটু ফাঁকি দিলে মা ঠাকরুনরা আর লাঠালাঠি করতে আসেন না।

নরোত্তম স্বপ্ন দেখে এক টুকরো জমির। নিজের জমি। পরের জমিতে হাল ঠেলে আর মন ভরে না। এবার নিজের এক ফালি জমি চাই। মনোমত এক ফালি দেখেও রেখেছে। বিঘে দেড়েকের এক দাগ বিলের জমি একটু তৈরী করে নিতে পারলেই মণ বারো-চোদ্দ ধান তো পাওয়া যাবেই। আর কলাইও ভাল হবে। এবারকার বতরটা উঠুক। সঞ্চয়ের কৌটোয় নাড়া দিয়ে যদি গতিক সুবিধে ঠেকে তো দুর্গা বলে ঝুলে পড়বে নরোত্তম। হালদার-গিন্নীর জমিটার উপর লাঙ্গলের ঈশটা চেপে দিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে ওঠে নরোত্তম। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, "মনস্কামনা পূর্ণ কর মা।"

বিন্দাবন খেজুর গাছের নীচ থেকে ডাক ছাড়ে, "ও নরা, আয়, একটান টেনে যা।"

গোঁফের উপর থেকে ঘাম মুছে নরা হ-হ-হ করে মোষের গতিরোধ করে বিন্দাবনের পাশে গিয়ে বসে।

বিন্দাবন বলে, "মেয়েলোকের জমি পাইয়ে যে খুব করে নিচ্ছিস! তোর শালা হাত পা কি লুহার! ব্যথা বিষও হয় না?"

"হয় না তোরে বলল কিডা, এই দ্যাখ্।"

নরোত্তম হাতের চেটো মেলে ধরল। ছোট বড় ফোস্কায় হাত ভরে উঠেছে।

"আজ ফোস্কা পড়েছে, আজ লাগছে, কাল এগুলো কড়া হয়ে

যাবে। আর লাগবে না, আচ্ছা উঠি। আর একটু বাকি আছে।"
বিন্দাবন চেঁচিয়ে বলে, "তুই শালা মানুষ না।"

নরা দাঁত বার করে হাসে। জবাব দেয়, "মোষ।"

দেড় বিঘে জমিতে যা ফসল হয়েছে, তা দেখলে বিশ্বাস হয় না। মণ ষোল ধান পেয়েছে নরোত্তম। সতের মণ কলাই। তার নিজের ফসল। তা ছাড়া ঘোষেদের সেজ-বউয়ের জমির ধান ভাগের ভাগ যা মিলেছে, সম্বচ্ছর একা মানুষের তাতেই চলে যাবে। খাজনাপাতি দিয়েও হাতে থেকে গেল শ খানেক টাকা। বাঁধের ধারে চার বিঘে ডাঙা জমির উপর ওর ইদানীং নজর পড়েছিল।

খাসমহলের বাবুকে কিছু টাকা খাইয়ে খুব সস্তায় সেটা হাতিয়ে নিল। নজর আরও উঁচুতে ওঠল। পরের বছর আর একটু। তার-পর এক ফালি বসত জমি কিনে পুব পোতায় ঘর একখানা তুলল। আর বাঁধল ছোট মত এক মরাই।

কঞ্জুস বলে অখ্যাতি রটেছিল নরোত্তমের। কিন্তু তা নরোত্তমের দোষ নয়। সাত বছর বয়েস থেকে আর এ পর্যন্ত একটি চিন্তাই ওর ছিল, একটি ধ্যান, একটি ক্রিয়া—রোজগার কর খরচ কোর না, প্রতিটি.পয়সা জমাও। জমি কেনো, ফসল জমাও। কেন জমাবে? কার জন্যে জমাবে? তা জানত না নরোত্তম। কত জমেছে তাও জানত না। ধান তুলত মরাইয়ে। খন্দকুটো তুলত বস্তায়। আর টাকা রাখত মাটির এক ঘটের মধ্যে। মাঝে-মিশেলে সবরেজেস্ট্রী অফিসে যেত। টিপ ছাপ দিত কাগজে, টাকা দিত দলিলদাতার হাতে। বাড়ি ফিরে আসত নতুন জমির মলিক হয়ে।

তারপর যতটা সম্ভব জমি নিজেই ভাঙত। বাকিটুকুন দিত বর্গাদারকে। পরে নিজের বাড়িতেই দুটো হেলে রাখল। কড়া নজরে চাষ করত। তাই কখনও নজর পড়ে নি নিজের দিকে।

যদি নরোত্তম মরেই যেত ওই নয়াঞ্জুলিতে পড়ে? গাড়িটা উল্টে? কি হত? কী হত তা হলে? নরোত্তম ভাবতে চেষ্টা করে। খবরটা

কোনরকমে হয়তো গ্রামে এসে পৌঁছত। গ্রামের লোক শুনত চুপ করে। বিন্দাবন বড়-জোর বলত ইস। এমন বেঘোরে মারা গেল বেচারা শেষটায়! বাস্, এর বেশী কিছু নয়। কেউ হা-হুতাশ করত না। দিন রাত্তির ওর বিচ্ছেদযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেউ মাথা ঠুকত না দেওয়ালে? চোখের জল ফেলত না? কেউ না? কেউ না?

নরোত্তম ভাবে। জিজ্ঞাসা করে। নিজেকেই বার বার জিজ্ঞাসা করে। নরোত্তম বার বার নিজেকে দেখে। এমনভাবে আর তো কখনও নিজেকে দেখে নি সে এর আগে। আর কখনও তো তার নিজেকে এত নিঃসহায় মনে হয় নি। মাঠ, গরু, মরাই এই নিয়েই কেটে গেছে তার, সকাল দুপুর সন্ধ্যে। দিন মাস বছর। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত। গ্রীষ্ম তার কাছে খটার ঋতু। জমি ভাঙো, চাষ দাও। বর্ষণ বপনের ঋতু। বোনা জমি সাফ রাখ। শীতে তোল নতুন ফসল। এই, এই ছিল তার জগৎ। এই ছিল তার জীবন।

তার সঙ্গী সাথী যারা ছিল, বিন্দাবন, ভোঁদা, নীলু, গুটক, বটক তার মত সফল কেউ নয়। আর মরাই যেমন ছিল, তেমনি আছে। যে হালুটি, সেই হালুটিই। যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। যে শরীর, সেই শরীরই। সেই খড়বিহীন চাল, শতচ্ছিন্ন বসন। মরাই নেই তাদের নরোত্তমের মত, মরাই-ভরা ধান নেই। গোয়াল-ভরা গরু নেই কারও। এমন সুন্দর মজবুত গাড়িও নেই কারও। ওদের অনেক দূরে ফেলে এগিয়ে এসেছে নরোত্তম, তা ঠিক। কিন্তু কোথায় এসেছে?

নরোত্তম চারিদিকে চেয়ে দেখে। বাড়িটাতে কেউ নেই। দুটো হালুটি ছিল, তারা মাঠে গেছে। রাখাল গোয়াল শূন্য করে গরু নিয়ে বেরিয়ে গেছে; অন্যদিন সে-ও যায়। আজ আর বেরোয় নি। বেরোয় নি তাই এই নির্জন এই খাঁ-খাঁ দুপুরে নিজের দিকে নজর পড়ল। কী নির্জন! কী স্তব্ধ! ওই মরাই, ও তো কথাই বলে না। এই ঘর, এ তো কারও হাসি কান্নায় ভরে ওঠে না। নরোত্তমের মনে হল তবে বোধ হয়, সে মরে গেছে। না হয় পথ ভুলে সে কোনও এক জনশূন্য মরুভূমিতে এসে পড়েছে। একটা দাঁড়কাক এসে বসল

বারান্দায়। নরোত্তর খুব চেঁচিয়ে তাকে ধমক দিল। আওয়াজ করে বাঁচল। কাকটা ভয় পেয়ে উড়ে পালাল। এ মরুভূমি, নরোত্তম মনে মনে বলল, নিতান্ত এক মরুভূমির মধ্যে পড়ে গেছে। সে মরে নি।

আর মরে গেলেই বা কার কী আসত-যেত? আচ্ছা, হঠাৎ তার মনে হল, যদি হরিদাসীর কানে পৌছত খবরটা? দু ফোঁটা চোখের জল কি পড়ত না তার? সে ছাড়া, ওরা ছাড়া নরোত্তমের আপনার জন আর কে আছে?

হরিদাসীর কথা মনে পড়তেই নরোত্তমের মনে পড়ল, হরিদাসীদের বাড়ির কাছে একটা গোহাট আছে। মনে পড়ল আগামী কালই হাটবার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, ভাল দুটো বকনা তার বড় দরকার। এত দরকার যে এই হাটেই না কিনলে আর চলছে না।

কোনও রকমে রাত্রিটা কাটল নরোত্তমের। সারারাত এপাশ ওপাশ করল। কয়েকবার উঠে মাথায় জল দিল। কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। যেটুকু বা ঘুম এল, তাও আবার অজস্র দুঃস্বপ্নে ভরা। একবার দেখল ও হরিদাসীর পথ ভুলে গেছে। পথের পব পথ বেরিয়ে গেছে চার দিকে। কত পথ! নরোত্তম পথের পর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে হরিদাসীর বাড়ির দিকে। কিন্তু কোথায় হরিদাসীর বাড়ি? হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত হল নবোত্তম, ক্লান্ত হল, এসে গেল তবু পৌছতে পাবল না। আর একবার দেখল ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল হরিদাসীব। ও যখন পৌছল ততক্ষণে হবিদাসী সেজে-গুজে শ্বশুরবাড়ির পথে রওনা দিয়েছে, আর-একবাব দেখল, হরিদাসী বসে আছে খুব এক উঁচু জায়গায়। নরোত্তম কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না তার। এমনি সব আজেবাজে স্বপ্ন দেখল সারারাত।

যাক, ভোর হতে নরোত্তম বাঁচল। বাঁচল এক অস্বস্তির হাত থেকে, দুশ্চিন্তার হাত থেকে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি জুতে রওনা দিল হরিদাসীর গ্রামে।

তবে, সেবার আর গরু কেনা হল না। পছন্দ হল না একটাও। আরও বার দুয়েক তাই যেতে হল। হরিদাসীরাও মায়ে ঝিয়ে বার

দুই-তিন এল। তারপর একদিন কুড়ি গণ্ডা টাকা পণ দিয়ে নরোত্তম হরিদাসীকে বিয়ে করে আনল।

নরোত্তমের সংসার উথলে উঠল একেবারে। যেটুকু বা ফাঁক ফোকর ছিল ভরাট করে দিল হরিদাসী।

মরাইয়ের সংখ্যা হল চার। ঘরের চালে উঠল টিন। শুধু একটা দুঃখ, একটা খেদ মনে। তিন বছরেও ছেলের মুখ দেখল না। প্রথম বছর নরোত্তমের চেষ্টার ফল ফলল না, দ্বিতীয় বছর ওষুধবিষুধেও কিছু হল না, তৃতীয় বছর তাবিজ তাগা শিকড়ও নিষ্ফল হল।

হরিদাসী বলল, "গুরুপুরুত বাড়িতে ডাক। এক মাস পাঠ, মাসান্তে অষ্টম প্রহর মোচ্ছব দাও। গোসাঁই বোষ্টম খাওয়াও।"

নরোত্তম বলল, "তাই হোক।"

ছুটল গুরুবাড়ি। গুরু বৃদ্ধ হয়েছেন, আর কোথাও যেতে আসতে পারেন না। গুরুপুত্র উপযুক্ত। যা করবার বর্তমানে তিনিই করেন। গুরুকে না পেয়ে গুরুপুত্রকে নিয়ে এল নরোত্তম।

হরিদাসীর কাজের অন্ত নেই। গুরুপুত্র এসেছেন, বাড়িতে ভগবান এসেছেন। হে ভগবান, দয়া কর। কোল-জোড়া ধন দাও। সেবা করতে লাগল কায়মনেবাক্যে। পা ধুয়ে জলটুকুও তুলে রাখে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে পান করে। চুল দিয়ে পা মুছে নেয়। আঁচলে বাতাস করে। গুরুপুত্র এক মাস ধরে কথকতা করবেন। এর পরে পুত্রব্রত মন্ত্র দেবেন হরিদাসীকে। গুরুপুত্রকে পেয়ে ভাঙা আশা জোড়া লেগেছে ওদের। সিদ্ধিদাতা কাছে আছেন, সিদ্ধি এবার নিশ্চিত। নরোত্তম পাগল হয়ে উঠল প্রায়। কুঁড়ে বাঁধবার সরঞ্জাম ঠিক করে ফেলল। দাই-বউকে আগাম কিছু টাকা দিয়ে রাখল, শুধু কি তাই? স্বপ্ন দেখল নরোত্তম। স্বপ্ন দেখল, দুটো কচি কচি হাতের। হাত বাড়িয়ে একটা কচি দেহ ধরেছে নরোত্তমকে। নরোত্তমকে ধরে বলছে, ও বাবা, এই তো, এই তো এলাম। আমারে বসতে দে, কনে বসব? নরোত্তম তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘুমটাকে দিল তাড়িয়ে।

নতুন জমি বায়না হবে একটা। গুরুপুত্র বলেছেন, খুব পয়মন্ত জমি। নরোত্তম শহরে গেল। তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে ফেলল। বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু নরোত্তমের কেবলই মনে হতে লাগল, স্বপ্নে-দেখা সেই কচি ছেলেটির কথা, যেন ছেলের কান্না শুনছে। ওর কেমন বদ্ধ ধারণা হল বাড়ি ফিরেই ছেলের মুখ দেখবে। দেখবেই। তাই গাড়ি-বোঝাই জিনিস কিনল। দোলনা ঝুমঝুমি নেটের ঢাকা ঝিনুক বাটি টুপি মোজা। যে যা বলে কিনে নেয়। কিনতে কিনতে টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন শান্ত হয়ে বাড়ির দিকে ফিরল।

ভোর ভোর বাড়ি ফিরল। কিন্তু কই, কান্না তো শোনা যাচ্ছে না। নরোত্তম এবার লজ্জা পেয়ে গেল। গাড়ি-ভর্তি জিনিসপত্র দেখে বেজায় লজ্জিত হল। হরিদাসী কী বলবে ?; মাথা খারাপ ? আরে, তা বলুক। আজ না হোক, কাল ছেলে তো হবেই, এ সব জিনিস তো আর নষ্ট হবার হয়। না হয় ঘরেই থাকল কিছুদিন। দোষ কি ?

বেশী আর সাড়াশব্দ করল না নরোত্তম। কেউ যে ওঠে নি এখনও। তা ভালই, কেউ দেখবার আগেই বরং মালগুলো তুলে রাখি। মোষ দুটোকে ছেড়ে দিল। তারপর জিনিসপত্রগুলো এক এক করে একটা ঘরে তুলে রাখল।

শোবার ঘরের দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল। হরিদাসী বিছানায় নেই। এত সকালেই উঠেছে ? কুয়োর ধারে নরোত্তম গেল পা ধুতে। শব্দ করে করে জল তুলল। হাত পা মুখ ধুল। কিন্তু হরিদাসীর সাড়া নেই। এমন তো হয় না, কোথায় গেল ? নরোত্তম গোয়ালটায় উঁকি মারল। নেই। রান্নাঘরে শিকল তোলা। এদিক ওদিক চাইতে নজরে পড়ল গুরুপুত্রের ঘরের দিকে। দরজা যেন খোলা খোলা ? কেন জানি ধক করে উঠল নরোত্তমের বুক। এক ধাক্কায় সে দরজা খুলে ফেলল। কেউ নেই। কেউ নেই! ওর শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। আমার ঘরটা দেখি! এক ছুটে নিজের ঘরে এল। ভাল করে চেয়ে দেখে হরিদাসীর তোরঙ্গটা নেই। তার

মানে কী? হরিদাসী কই? গুরুপুত্র কই? এদের জামা কাপড় কই? তোরঙ্গ বিছানা কই? কই? কই? কই? তবে কি ওরা, কী তবে, ওরা কী—ওরা কী—! কিন্তু যে কথাটা জানা সত্ত্বেও বোঝা সত্ত্বেও ভাবতে পারছিল না, ভয় পাচ্ছিল, তা আর চেপে রাখতে পারল না। পালিয়ে গেছে।—কথাটা মনের অতি গোপন থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠল বমির দমকের মত। ওরা পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে! ওঃ! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নরোত্তম। ও চায় নি। জানে, কোন লাভ নেই। কেউ নেই। তবু চিৎকার করে ডাক দিল, "হরিদাসী!" তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল।

পাড়ার লোক চিৎকার শুনে ছুটে এল। দেখে নরোত্তম অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

বেলা গড়িয়ে গেল। নরোত্তম ঠায় বসে আছে। নিস্পন্দ নির্বাক। একটা কথাও বলে নি। মাথা তোলে নি। সেই ভাবেই বসে আছে। কত লোক এল, গেল। সান্ত্বনা দিল, সমবেদনা দেখাল। নরোত্তম তবুও বসে, বনস্পতি বজ্রাহত। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। সান্ত্বনাবারিতে কী হবে? নতুন পাতা গজাবে? নরোত্তম ঠায় বসে।

এই হরিদাসী! এই তার স্ত্রী! তার স্ত্রী? তার কবে বিয়ে হল? হয়েছে। বিয়ে, এই ভালবাসা! নরোত্তমের জমে-যাওয়া দেহ চিন্তার চাঞ্চল্যে একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফাঁকা আকাশে ঘৃণার মেঘ উড়ে উড়ে আসে, ধীরে ধীরে সমস্ত মনে বিতৃষ্ণা জমাট বাঁধে। ঘৃণা তীব্রতর হয়। নিচু মাথাটা ধীরে তোলে। দেয়ালে নজর পড়ে। হরিদাসীর রামধনু শাড়িটা বাতাসে অল্প অল্প দুলছে, হরিদাসীর শাড়ি। এই তো হরিদাসী! হঠাৎ কেমন এক অন্ধ ক্রোধে দিশাহারা হয়ে পড়ে নরোত্তম। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একটানে শাড়িটা পড়-পড় করে ছিঁড়তে থাকে। ভাল লেগে যায় তার। কেমন! কেমন! আরও শাড়ি আনে। ছেঁড়ে। কেমন একটা উল্লাস যেন নরোত্তমের ঘাড়ে চেপে বসেছে। শাড়ি তো ছেঁড়ে না। ছেঁড়ে হরিদাসীকে।

ছেঁড়ে গুরুপুত্রকে। অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক মানুষগুলোকে যদি এমন ধারা ছিঁড়তে পারত? ছিঁড়তে ছিঁড়তে নরোত্তম দেখে এক সময় কাপড়ের স্তূপ হয়ে গেছে। এত কাপড় ছিল হরিদাসীর? এত কাপড় কিনেছে নরোত্তম? এত টাকা খরচ করেছে? এত টাকা রোজগার করেছে? সে? নরোত্তম? এই দুই হাতে? স্মৃতির ভিড় ঠেলে সামনে আসে নরোত্তম নয়, নরা। ন বছর বয়স। বিশ্বাস-দের দেওয়া গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে। সেই প্রথম তার অঙ্গ ঢাকা পড়ল সুতোর ঘেরে। শরীর ছাইতে একটা গামছাই যথেষ্ট। এত কাপড় তো নিষ্প্রয়োজন, নিতান্ত অপচয়। আর খেয়ে না-খেয়ে এত কাপড় যোগাড় করেছে সে! আর-একখানা কাপড় টেনে আনতে গিয়ে হোঁচট খেল নরোত্তম। শুধু কি কাপড়? পায়ের ধাক্কা লেগে থালা গেলাস বাসন বাটি সব শব্দ করে উঠল। ঠং। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে আকস্মিক এই ধাতব আওয়াজে নরোত্তম চমকে উঠল। ঠং। চেয়ে দেখলে ঘরের এক কোনায় জড় করা আছে বাসন। ঠং ঠং ঠং ঠং। থালা গেলাস বাটি ঘটি ঘড়া। কত জিনিস শুধু ঠং ঠং ঠং, শুধু ঝন ঝন ঝন। নরোত্তম যে দিকে চায় সে দিকেই জিনিস। ওর দৃষ্টি জিনিসের তাড়া খেয়ে পালায়। কোথাও একটু ফাঁকা নেই। কোথাও একটু আশ্রয় নেই। এ কোণে ও কোণে, খাটের নীচে, মাথার উপরে শুধু ঘড়া আর ঘটি আর লেপ আর কাঁথা আর বাক্স আর বিছানা। আরও কত অজস্র, অগণিত টুকিটাকি। চোখ দুটো তাড়া খেয়ে খেয়ে হয়রান হয়ে গেল। কোথায় পালাবে? আশ্রয় কই? সমস্ত বন ঘিরে শিকারীরা জঙ্গল পিটছে। হতভম্ব হরিণ পালাবে কোথায়? নরোত্তম দেখল, এই জিনিসগুলো জোট পাকিয়ে নিঃশব্দে অতি ধীরে অতি নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। স্পষ্ট দেখল নরোত্তম। এগিয়ে আসবে, নরোত্তমকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে, তারপর ধীরে ধীরে ঠং ঠং ঠং পাষাণ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে ফেলবে তার। ভয় পেয়ে যায় নরোত্তম। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে ভয়ে। পালাও। পালিয়ে বাঁচ। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ

করে দিল ঠেসে। যেন বাইরে বেরুতে না পারে ওরা—ওই জিনিস-গুলোর একটিও। ছুটে গিয়ে বিচালি আনল। বাণ্ডিল করে আগুন ধরাল। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা ফাঁক করে ঘরের মধ্যে আগুনটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রাণপণে দরজাটা এঁটে দিল। কাউকে বেরুতে দেবে না। কাউকে না। কত জিনিস, কার জিনিস, শিকল এঁটে উঠনে এসে উল্লসিত নরোত্তম হাসতে লাগল, হা—হা—হা—হা—হা—।

প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখে নরোত্তমের চালে চালে দাউ দাউ আগুন। পট পট খুঁটি ফাটছে; গরুবাছুর ভয়ে চিৎকার করছে। ছুটোছুটি করছে। পোড়া জিনিসের বিশ্রী চিমসে গন্ধে উঠন বাড়ি ভরে উঠেছে। তারাও ছুটোছুটি করল।

মুক্তির আলো পেয়েছে নরোত্তম। ঝাড়া হাত-পা।

আঃ, কী আনন্দ! এতদিন কি অন্ধ ছিল। কী অন্ধ ছিল, ছুটো চোখ আবরিত ছিল তার। এক চোখ ঢেকে রেখেছিল বউ, আর-একটা বিষয়। একটা কামিনী আর একটা কাঞ্চন। ছুটোই ফুটেছে। ঝামেলা চুকেছে ও মায়াপ্রপঞ্চের স্বাদ পেয়ে গেছে। ও মন বিষয় সুত দারা পায়ের বেড়ি তারা, অন্ধ কারা জেনো এ ভব-সংসার। নেই, নেই, কিছু নেই তার। সব পিছনে ফেলে এসেছে। এখন এক চিন্তা, এক ধ্যান, তুফান-ভরা ভবের নদী সাঁতার কেটে মার পাড়ি। একান্তে নদীর ধারে বসে দাড়ির জট ছাড়াতে ছাড়াতে গুনগুন করে গান করে নরোত্তম। গান গায়। বিষয় বিষের চিন্তা আর কাবু করে না নরোত্তমকে। এই সন্ন্যাসী জীবনে তার একমাত্র অস্বস্তি এই দাড়ি আর মাথার জট। অস্থির করে তাকে। উকুনে ভরে গেছে। থিগ-বিগ করে, থিগবিগ করে রাতদিন। চুলবুল চুলবুল করে, আরাধনায় বাগড়া দেয়। মন নিবিষ্ট করবে সাধ্য কী? কুটকুট কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ে নরোত্তমের ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে গড়া দেহখানা। এই মাটির দেহ পঞ্চ-ভূতের বশাবশ। নামের সরষেপড়া দাও ছুড়ে মন, মিটিয়ে দাও এ আকিঞ্চন। কিন্তু নামের সরষে পড়তে

যতটুকু নিবিষ্টতা দরকার তাও বা নরোত্তমের কই? মাথা আর দাড়ি রাতদিন পারাপার করছে মন। তাই শেষ পর্যন্ত এক আকিঞ্চন যোগাড় করল। লোকালয়ে গেল। হাটে গেল। ভিক্ষে-সিক্ষে করে আনল একটা ভাঙা চিরুনি।

চিরুনি মাথায় ঠেকাতেই নরোত্তমের মনে পড়ল হরিদাসীর বাস-মাখা চিরুনিখানার কথা। সেই চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে বড় ভালবাসত নরোত্তম। হরিদাসীর গন্ধ নাকে লাগত কিনা। হরিদাসীর চুলের গন্ধ, দেহের গন্ধ লেগে থাকে। আবার হরিদাসীর কথা! পাতকী মন হরিদাসীর গন্ধে ছুটে চলল। সর্বনাশের গোড়া চিরুনিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নরোত্তম। আবার সংসারচিন্তা। আর না, আর না। প্রভু, হে দয়াল, আর না, এ সংসার পঙ্ককুণ্ডে, নরদেহ নরককুণ্ডে ফেলো না ফেলো না মোরে হে ভব-কাণ্ডারী।

নরোত্তম উঠে পড়ল। চঞ্চল হয়ে অস্থির হয়ে ছুটতে লাগল চিরুনিখানা থেকে দূরে, যত দূরে পারে।

শ্মশানে এলেই শান্তি আসে নরোত্তমের। শ্মশান মানে মৃত্যু। আর মৃতের মত শান্ত কে? মন চঞ্চল হলে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলেই নরোত্তম শ্মশানে এসে বসে। মনকে শাসন করে শ্মশানের স্তব্ধতা দিয়ে। এই নীরেট নীরবতায় বেবশ মন স্ববশে আসে।

নরোত্তম শ্মশানেই ছুটে আসছিল। পথের পাশে এক ঝোপ। হঠাৎ একটা শেয়াল খ্যাঁক করে উঠল। আর 'মা গো' বলে এক কাতর কান্না। নরোত্তম আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ঢিল কুড়িয়ে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে মারল। দুটো শেয়াল পালিয়ে গেল। নরোত্তম উঁকি মেরে দেখল এক শিশু। পায়ের খানিকটা শেয়ালে কামড়ে নিয়েছে। রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। নরোত্তম আর স্ববশে নেই। কী করছে আর বোঝবার ক্ষমতা নেই; ছুটে গিয়ে শিশুটাকে কোলে তুলে নিল। যত ছোট ভেবেছিল তত ছোট নয়। বছর পাঁচ-ছয়েকের মত হবে। একটা মেয়ে। সর্ব্বাঙ্গ মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন। নরোত্তম বলে উঠল, আহা, কার ধন রে। একেবারে কোলজোড়া

মানিক। কোলজোড়া ধন দাও ভগবান। হরিদাসীর প্রার্থনা মনে পড়ল নরোত্তমের। ও বাবা, আমি আলাম, বসব কনে? মনে পড়ল নরোত্তমের। আহা রে! সোনা রে! আবার মায়া? মায়ার ফাঁস? গলায় পরা! লজ্জা নেই? শিক্ষে হয় নি? ছি-ছি, আবার সেই ফাঁদে পা! ফের মায়ার পাশে বাঁধা! নরোত্তম মেয়েটিকে আবার সেখানেই রেখে পা বাড়াল। হঠাৎ নজরে পড়ল শেয়াল ছুটো দাঁড়িয়ে জিভ চাটছে। আর কানে ঢুকল মেয়েটির কান্না।

নরোত্তমের সব গোলমাল হয়ে গেল। ছুটে ফিরে এল। মেয়েটিকে তুলে নিল বুকে। উন্মাদের মত চুমু খেল তার গুটিকা-আচ্ছন্ন মুখটিতে। ধন আমার, বাবা আমার। তারপর ছুটতে শুরু করল। বন থেকে লোকালয়ে। তার বাড়িতে।

নরোত্তম মেয়ের নাম রেখেছে কুড়োনী। পড়ো ভিটের বড় ঘর এখনও তোলে নি। শুধু একটা চালা মেরামত করে নিয়েছে এখনকার মত। ছোট চালায় দুজনে থাকে। গরু বাছুর গোটাকতক পেয়েছে। জমি জমার বিলি ব্যবস্থা ফিরে করতে হবে। তাই আবার শহরে যাওয়া। গরুর গাড়ি করে বাপে মেয়েতে শহরে গেল। মেয়ের জন্য এটা সেটা জিনিস কিনে গাড়ি বোঝাই করল। মেয়েকে হোটেলে খাওয়াল। ম্যাজিক দেখাল। এবার বাড়ি ফেরা। গাড়িতে ঢুকতেই কুড়োনীর গায়ে হুড়মুড় করে জিনিস পড়ল গড়িয়ে। ঝন ঝন ঝন, মেয়ে রেগে গেল বেজায়। লাফ দিয়ে নীচে নেমে ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নরোত্তম দেখে অবাক। ডাকল, "ও মা, ও সোনা, বাইরি ক্যান, ওঠ গাড়িতে ওঠ।"

কুড়োনী ফোঁস ফোঁস করে বলল, "জিনিস দিয়ে তো গাড়ি বুঝাই করিছিস! বসব কনে?"

নরোত্তম গাড়ির ভেতর উঁকি মারল। জিনিসে জিনিসে ভর্তি। হেসে ফেলল। বলল, "জিনিসের জন্যি গাড়ি। কিন্তু তোর জন্যি যে আমার কোল। আয় মা, আমার কোলের উপর বোস্।"

ভিখারী মেয়েদের নিয়ে কি গল্প লেখা যায় না? যায়। তবে ম্যানেজারকে নিয়ে যায় কি না, তাই হল প্রশ্ন।

প্রথমত: ম্যানেজারকে ভিখারী বলতে, কেন জানি না আমার বাধে। আর দ্বিতীয়ত: মেয়ে হয়েও ম্যানেজারের মেয়েলী সম্পদ এমন কিছু নেই—তার রূপ নেই, বয়েস নেই, তার স্বাস্থ্য নেই—যা ভাঙালে গল্পের উপাদান গড়ে তোলা যায়।

প্রথম যখন ওকে দেখি, বোধ হয় ১৯৩৬ সালে, তখনও ম্যানেজারের সহায় সম্পদ কিছু ছিল না। জট-পাকানো চুল, ময়লা চিট ছেঁড়া কাপড় আর দড়ি-পাকানো পুরুষ-অরুচি দেহ। অবশ্য সেই তখন, নারীদেহের, বিশেষ করে বয়স্কাদের বিচার করবার এলেম আমার তৈরী হয় নি।

সেই তখনই, ম্যানেজার চলতে গিয়ে হাঁপাত, কুঁই কুঁই করে কথা বলত, কখনও-সখনও আমাদের ঘর আগলে বসে থাকত, দোকান থেকে তেল মসলা কি গঙ্গা থেকে এক ঘড়া জল বললে এনে দিত।

ম্যানেজারের জীবন চলত মাধুকরী করে।

নবদ্বীপ গোসাঁই বোষ্টমের জায়গা। হাতে পাত্র নিয়ে যাবার সময় গৃহস্থ বাড়ির দরজায় 'জয় রাধে' বলে দাঁড়ালেই ভাত তরকারি পাওয়া যেত। একেই বলে মাধুকরী। দু-তিন বাড়ি ঘুরে এলেই পাত্র পূর্ণ হত। আর ম্যানেজারও তার খোপে গিয়ে ঢুকত। দু-তিন দিন আর তার টিকি দেখা যেত না। কিছু খাবার থাকলেও কচিত সে বেরত। হয়তো এসে বলত, ও খোকা, ঘরে পেঁজ আছে? দেওনা এটটা। হয়তো বলতাম, বিধবা মানুষ, তুই পেঁয়াজ কী করবি? একটু হেসে ম্যানেজার জবাব দিত, পরশু দিন গৌরাঙ্গবাড়ি থেকে খিচুড়িভোগ এনেলাম। আজ খাতি গিয়ে দেখি গন্ধ ছাড়ছেন। পেসাদ নষ্ট

করতি তো নেই। তাই ভাবলাম, একটা পেঁজ দেখি যদি খোকার কাছে পাই।

বাক্যব্যয় না করেই একটা পেঁয়াজ তার হাতে দিতাম। সেও চলে যেত।

আর সে আমাদের ফাইফরমাশ খাটত।

বাবা বলতেন, ম্যানেজার, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুই আমার এই কাপড় আর রুমালটায় সাবান দিয়ে রাখিস, বুঝলি?

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বাবার আধময়লা ধুতি আর রুমাল নিয়ে চলে যেত। তখন বেশ সকাল। তারপর ম্যানেজারের আর পাত্তাই পাওয়া যেত না।

বাবা ফিরতেন রাতে। প্রায় নটা-দশটায়। ডাক দিয়ে বলতেন, ম্যানেজার, কাপড় কাচা হয়েছে?

সে বলত, হ্যাঁ।

কাপড় কোথায় রাখলি?

বালতির মত্থি।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কেন, বালতির মধ্যে কেন?

কুঁই কুঁই করে সে জবাব দিত, এখুনো নীল দেওয়া হয় নি।

বাবা রাগ করতেন। বকতেন। প্রতিজ্ঞা করতেন জীবনে আর কখনও ম্যানেজারকে কোন কাজের ভার দেবেন না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখা যেত না। বাবা কেন, কেউই পারতেন না।

পাড়ার সবাই ম্যানেজারকে কাজের ভার দিত। সবাই চটত ওর উপর।

কিন্তু ম্যানেজারের মনিব ছিল না কেউ।

সে বছর বন্যা হল। রানীর চড়া, বড়ালের ঘাট, শ্রীবাস-অঙ্গন, ফাঁসিতলা, বনচারীর বাগানে ডুবজল হয়ে গেল মানুষের। ভাদুড়ী গর্তে গঙ্গার জল পড়ে ভাসিয়ে দিল রাধাবাজার। রামসীতাপাড়ার মোড় পর্যন্ত ডুবে গেল। বড় আখড়া গোবিন্দবাড়ি জল থৈ-থৈ। আগমেশ্বরী পাড়ার রাস্তা ডুবে বাগচি-বাড়ির কাছে জল পৌঁছে গেল।

ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে আশ্রিতের ভিড়। আমাদের সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল।

বাংলা পরীক্ষা সেদিন। আমরা ভিজে ইস্কুলে গিয়েছি। পরীক্ষা শেষ না হতেই হেড বেয়ারা রজনী ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে গেল। হেড মাস্টার মশাইয়ের নোটিস তার হাতে। ইস্কুল দু সপ্তাহের

বাড়ি ফেরার সময় তারু হাত ধরে টানল। হাসতে হাসতে বলল, বেশ মজা, না!

বললাম, মজা তো হবেই, আরও সময় পেলি। রাতদিন পড়বি।

তারু ফার্স্ট বয়। বিধবা মায়ের শিবরাত্রির সলতে। তা সলতের মতই চেহারা বটে। রোগা, লাজুক, ভীতু।

বলল, দূর, পড়ার কথা বলছি নে, জলের কথা বলছি। শহরের ভিতরে জল জীবনে দেখি নি। আমাদের রেল-বাঁধ প্রায় ছাপিয়ে এল, বুঝলি? আর দু দিন পরেই এপাশে জল উপছে পড়বে। নায়েগ্রা প্রপাতের ছবি দেখেছিস, ওই রকম জল পড়বে। আঃ, কি মজা!

কী এক দুরন্ত খুশিতে তারুর নিস্তেজ চোখে উৎসাহের প্লাবন ছুটল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কী করে বাড়ি যাবি?

আমি তখন বনচারিবাগানে থাকি। পাতালবাবার বাড়ির কাছে জলে জলে বাড়িটা আমাদের জাহাজের মত ভাসে। আর দু আঙুল জল বাড়লেই ঘরে জল উঠবে।

বললাম, মতি রায়ের বাঁধ পর্যন্ত নৌকায় যাব। তারপর যাব আমার ভেলায়।

ভেলার কথাটা মিথ্যে করে বললাম। আসলে ও পথটুকু হেঁটেই যাব।

তারু ভেলার কথা শোনামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, তোর ভেলা আছে? নিজের ভেলা?

আমি জো পেয়ে বললাম, হ্যাঁ। আমাদের ওদিকে তো সক্কলের ভেলা আছে।

তারু আমার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাইল। বলল, তবে তো তুই নাবিক রে।

তারপর যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি রাজ্যে চলে গেল!

বলতে লাগল, তোর কী ভাগ্যি! তুই তো ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি যেতে পারিস, তোর বাড়ির বন্দর থেকে ভেলা ছাড়বি। খাটিয়ে দিবি একটা পাল। শহরের নর্দমা বেয়ে পড়বি গিয়ে গঙ্গায়, তারপর বঙ্গোপসাগর, সেখান থেকে ভারত মহাসাগর তারপর প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক, গিয়ে ভিড়বি আফ্রিকার কূলে। ইচ্ছে করলে কঙ্গো নদী ধরে ধরে ভিতরে চলে যেতে পারবি। ভিক্টোরিয়া নায়াঙ্গা হ্রদ, রুয়েনঝারি পর্বতমালা, কত কী দেখতে পারিস ইচ্ছে হলে। কলম্বাস, ভাস্কো ডি গামা, কাপ্টেন কুকের মত কত দেশ আবিষ্কার করতে পারিস! সত্যি ভাই, তোরাই মানুষ।

আবেগে আমার হাত দুটো ধরে রেখেছে তারু। উত্তেজনায় কাঁপছে থর থর করে। তার হাতের তালু ঘেমে উঠেছে। হঠাৎ তার উত্তেজনা ঝিমিয়ে এল।

কাতরভাবে বলল, আর আমি তো বন্দী, মা কোথাও যেতে দেয় না। কোথাও ছাড়ে না, খালি ভয় কখন বুঝি অপঘাতে মরি। খালি ইস্কুল আর বাড়ি। একদম ভাল লাগে না। জানিস, সমুদ্র রোজ আমায় স্বপ্নে ডাকে। আফ্রিকা আমাকে হাতছানি দেয়। সমুদ্র আমাকে বলে, আয় তারু, চলে আয়। আমি বলি, কী করে যাব? তুমি কোথায় থাক, আমি কোথায় থাকি! সমুদ্র সে কথা শুনে কী বলে জানিস?

আবার তারু উত্তেজিত হয়ে উঠল। চোখে মুখে ফুটে উঠল অস্বাভাবিক দীপ্তি। আমার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চাপা উত্তেজনায় ফিস ফিস করে বলতে লাগল, তবে শোন্। এতদিন এ কথা কাউকে বলি নি। তোকেই শুধু বলছি। সমুদ্র আমার কথা শুনে বলল, তার জন্যে তুই ভাবিস নি তারু। আমি তোর কাছে জল পাঠাব। তুই একটা ভেলায় চড়ে আমার কাছে চলে আসবি।

তারপর যেখানে যেতে চাইবি ধ্রুবতারা দেখে নিশানা বলে দিস। আমার হুকুমে বাণিজ্যবায়ু তোকে সেখানে নিয়ে যাবে।

এবার তারুর শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। বলল, সমুদ্র তার কথা সত্যি সত্যিই রেখেছে। জল সে পাঠিয়েছে। দেখিস একেবারে আমার ঘরের দরজায় এসে যাবে।

হঠাৎ কাতর মিনতি করে বলল, তোর ভেলাটা আমায় দিবি ভাই?

আমার যেন কী হল তখন। তারুর প্রত্যেকটা কথা আমি বিশ্বাস করে ফেললাম। আর সে বিশ্বাস এমন গভীর আর এত পবিত্র যে আমার সমস্ত মিথ্যে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল।

অকপটে তারুকে আমি বললাম, আমার ভেলার কথাটা মিছে বলেছি। তবে ভেলা তৈরি করাটা এমন শক্ত কিছু নয়। আমি দু দিনে ভেলা বানিয়ে ফেলব। তুই আমাকে সঙ্গে নিবি তারু?

আমার ভেলা নেই শুনে তারু একটু মুষড়ে গেল।

ওকে সাহস দিয়ে বললাম, তুই বিশ্বাস কর্, ঠিক দু দিনে আমি তোকে সুন্দর ভেলা বানিয়ে দেব। তোদের পাড়ায় কলাগাছ আছে?

তারু যেন আবার চাঙ্গা হল। বলল, আমাদেরই আছে। খিড়কি ডোবার ধারে। বেশ, তুই বানা ভেলা। তবে তোকে নেব কি না বলতে পারব না। সমুদ্র যদি বলে নেব, কেমন?

বললাম, বেশ, তাই।

দু দিন তারুর বাড়িতে গেলাম। তারপর চুপি চুপি ভেলা বানিয়ে খিড়কি পুকুরে ভাসিয়ে রেখে যেদিন বাড়ি ফিরছি, সেইদিনই তারুদের পাড়ায় হৈ-হৈ। রেল-বাঁধ ভেসেছে। শুনেই আমার তারুর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল, আর কেন জানি নে আমার সর্বশরীর যেন ফুলে উঠল।

কাল পরশুর মধ্যেই তারু সমুদ্রে ভাসবে। ঠিক ভাসবে। আমাকে নেবে কি না কে জানে? হে সমুদ্র, মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আমাকেও টেনো।

বাড়ি ফিরে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। আমাদের বারান্দায় ভিজে জবজবে হয়ে ম্যানেজার পড়ে আছে। অচৈতন্য, বাবা ওর শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার চেষ্টা করছেন। লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কী ব্যাপার? ম্যানেজার নাকি হাঁটুজলে ডুবে মরছিল। তার ঘরে হাঁটুসমান জল। তার মধ্যেই সে পড়েছিল অচৈতন্য হয়ে। বাবা কি কাজে ওকে ভাগ্যিস ডাকতে গিয়েছিলেন!

আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর ম্যানেজারের জ্ঞান ফিরল। আরও ঘণ্টা দুয়েক বাদে চাঙ্গা হল। তখন কুঁই কুঁই করে যা বলল তাতে জানা গেলঃ জ্বর হয়েছিল বলে ও দিন তিনেক বেরুতে পারে নি। কিছু খায়ও নি। কেউ খোঁজও করে নি। সেদিন বেরুবে বলে যেই দাঁড়িয়েছে অমনি মাথাটা ঘুরে গেল। তারপর আর কিছু সে জানে না।

সেই রাত্রে আমারও জ্বর এল। বেদম জ্বর। সাত দিন পরে পথ্য করলাম।

এর মধ্যে জল নেমে যাওয়ায় শহরের খোয়া-বাঁধানো পথঘাট পাইওরিয়া-রোগীর মতো মাড়ি বের করে হাসতে লাগল। কদিন পরে পরীক্ষা। কোন রকমে পড়া তৈরি করে ভয়ে ভয়ে ইস্কুলে গেলাম।

কিন্তু পরীক্ষা হল না। ইস্কুল আবার ছুটি হয়ে গেল। তারু মারা গেছে বলে।

হেড মাস্টারমশাই ক্লাসে এসে গম্ভীরভাবে দুর্ঘটনার কথা জানালেন। বললেন, রেল পুলের নীচে তারুর দেহটা এক দিন পরে পাওয়া যায়। কিছুদূরে একটা ভেলাও পাওয়া গেছে। তাতে তারুর জামা-কাপড়ের একটা পুঁটুলিও ছিল। ভেলায় করে তারুর মত ছেলে অমন সাংঘাতিক জায়গায় কী করে গেল কেউ নাকি বলতে পারে নি।

ছুটির পর তারুর খিড়কি ডোবা দেখবার জন্য পা দুটো আপনা

থেকেই সেদিকে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল তারুর মার ভাঙা গলার বুকফাটা কান্নায়।

ছুটে বাড়ি ফিরে এলাম। সমস্ত জগৎ যেন মিথ্যে হয়ে গেছে

হঠাৎ দেখি ম্যানেজার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। রোগব্যাধির কোন বালাই নেই।

কুঁই কুঁই করে বলল, খোকা, দুটো পয়সা দেবা? ছোলার ছাতু খাতি মন চাচ্ছে।

তারুর শোকে আমার ছেলেমানুষ-প্রাণ মুষড়ে থাকে নি বেশীদিন

দিনগুলো তরতর করে বয়ে গিয়েছিল নীর কাকিমার জীবনস্রোতে। এর মধ্যে ম্যানেজারকে একবার ষাঁড় গুঁতিয়ে দিল। দু মাস আর উঠতে পারে নি বিছানা ছেড়ে। সবাই ভেবেছিল, এবার সে মরবে নির্ঘাত। কিন্তু ম্যানেজার মরল না।

গোপাল কাকার বউ রাতদিন সেবা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। সে যে কী সেবা না দেখলে বোঝা যায় না। আমি অবশ্য দেখি নি। মার মুখ থেকে শুনেছি।

মা বলত, নীর আর-জন্মে ম্যানেজারের পেটের মেয়ে ছিল। নইলে অত সেবা কেউ করে! সারা গা ফেটে ঘা হয়ে গিয়েছিল। দুর্গন্ধে ভূত পালাত। কিন্তু নীর কাকিমা সেসব ভ্রুক্ষেপ করত না। যত্ন করে ঘা ধুয়িয়ে পটি বেঁধে দিত।

গোপাল কাকা যে দুম করে বুড়ো বয়সে এক বিয়ে করে বসবে এ কেউ ভাবে নি তাও নীর কাকিমার মত অল্পবয়সী একটা মেয়েকে। আমি তখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি। নীর কাকিমা সেই সময় আমাদের বাড়িতে এসে কিছুকাল ছিল। মার তখন শরীর খারাপ। সদ্য আমার একটা বোন হয়েছে।

সংসার আমাদের প্রায় অচল হয়ে উঠেছিল, এমন সময় গোপাল কাকা বউ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির।

গোপাল কাকা ওই এক ধরনের লোক। নিজের কাকা নয়,

আত্মীয়তাও কিছু নেই। কাজকর্মও কিছু করে না। একেবারে পুরো বাউণ্ডুলে। তিনকুলে কেউ আছে বলে শুনি নি।

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে থাকে আবার এক সময় উধাও হয়ে যায়। সেবার, মাস তিনেক নিরুদ্দেশ থাকবার পর গোপাল কাকা একেবারে বউ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাবার পায়ে হাত দিয়ে আর মাকে উদ্দেশ করে—মা তখন উঠতে পারে না কিনা—যুগলে প্রণাম করল ওরা।

গোপাল কাকা বাবাকে বললেন, মুরুব্বী বলুন, কুটুম্বু বলুন, এ শহরে আপনিই আমার সব। তাই বউ নিয়ে সোজা আপনার কাছেই চলে এলাম। একটু চরণে স্থান দেবেন।

মাকে বললে, বউদির দেখছি শরীর খারাপ। তা কিছু ভাববেন না, কাজকর্ম নীর ভালই জানে। ওর নাম নীরবালা।

নীর কাকিমাকে বললে, যাও, একেবারে চান করে নিয়ে হেঁশেলে গিয়ে ঢোক। তোমার নিজের ঘরও এমন আপন পেতে না।

বলেই গোপাল কাকা ভেগে পড়ল। সেই যে ভেগে পড়ল, আর দেখা নেই।

নীর কাকীমা একদিনেই সবাইকে আপন করে নিলে। মার মত লোকও 'নীরু' বলতে অজ্ঞান আর বাবাও 'বউমা' ছাড়া গতিরন্যথা।

আমি? হ্যাঁ, আমিও খুশী। খুব খুশী। প্রথমতঃ ইস্কুলের ভাত ঠিক সময়ে পেতাম; আর দ্বিতীয়তঃ নীর কাকিমার ফাইফরমাশ খেটে ধন্য হবার সুযোগ পেলাম বলে।

নীর কাকিমারা একটা বয়সে আমাদের মত না-পুরুষদের জীবনে আসে বলেই না আমাদের অস্পষ্ট চেতনায় বুঝতে পারি যে আমরাই আগামী দিনের পুরুষ।

সেদিন কিন্তু এমন কথা ভাববার বয়স হয় নি, বুদ্ধিও না। সেদিন নীর কাকিমার আমি ছিলাম সুখ-দুঃখের সঙ্গী, সখা।

মনে আছে, প্রথম রাতের কথা। সারাদিন ধরে খেটেখুটে

নীর কাকিমা আমাদের সংসারের ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যে হতেই দেখি আমার পড়ার পাটিতে পরিষ্কার এক লণ্ঠন। আমি তো অবাক। এই নাকি সেই লণ্ঠন যার কাচ সর্বদা ভুস-কালো হয়ে থাকত! ওটা পরিষ্কার করবার ভার ছিল আমার উপর। কিন্তু আমার হাতে কাচের কালি কোনদিনই ঘোচে নি। ম্যানেজারকে দিয়েও অনেক বলে কয়ে সাফ করিয়েছি কখনও কখনও, কিন্তু ফল হত উনিশ-বিশ। নীর কাকিমার হাতের ছোঁয়ায় এখন দেখি লণ্ঠনও স্থিরভাবে হাসছে।

হাসতে হাসতে বললাম, নতুন বউ, কী করে ও ভূতো কাচ এরকম চকচকে হয়ে উঠল?

নীর কাকিমা, নীর কাকিমা করে এখন বলছি বটে, আসলে আমি ওকে নতুন বউ বলতাম।

কী যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় হাঁকডাক করে বাবা এসে পড়লেন, আর নীর কাকিমা পালিয়ে গেল ভিতরে।

বাবার পিছনে দেখি মুটে। এক ঝাঁকা কী সব জিনিস। আর ঘর ম-ম করে উঠল ফুলের গন্ধে।

বাবা বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে মাকে বললেন, ওগো, ফুলশয্যার জিনিস এনেছি। একটা ঘর খালি করে দিতে হবে। ভায়া আমার ভাবলেন বোধ হয় যে দাদাকে খুব জব্দ করেছি। হুঁ, ভূষণ জব্দ হবার পাত্র কিনা!

আমাকে বললেন, খোকা, ম্যানেজারকে ডাক্ তো। ডেকে তোরা দুজনে হাতেপিতে তোর ঘরটা সাজিয়ে ফেল্।

নিজের হাতে বিয়ে সংক্রান্ত কোন উৎসব আমার এই প্রথম। প্রচণ্ড উৎসাহে লেগে পড়লাম। ম্যানেজারকে ডাকতে যাবার সময় উঁকি মেরে দেখি, নীর কাকিমা জড়সড় হয়ে বসে আছে।

যাবার সময় বলে গেলাম, নতুন বউ, আজ তোমার ফুলশয্যে। কী মজা!

ম্যানেজারকে নিয়ে ফিরে আসতেই মা ডাকল: এই দেখ্ খোকা, উনি নীরুর জন্যে কাপড় এনেছেন।

কী সুন্দর কাপড়খানা। নাঃ, বাবার চোখ আছে।

শুধু কাপড় নয়, টুকিটাকি আরও অনেক জিনিস বাবা এনেছেন, মার ইচ্ছে সেগুলো দেখি। কিন্তু সময় কই? আমার তখন ঘর সাজাবার তাড়া। এমনিতে সন্ধ্যে না-হতেই আমার ঘুম এসে যায়। কিন্তু সেদিন ঘুমটুম সব মাথায় উঠল।

রাত সাড়ে দশটায় আমার কাজ শেষ হল। ম্যানেজার বিছানা পাতল পরিপাটি করে। সাদা ধপধপে এক নতুন চাদর বিছিয়ে দিতেই কী যে এক শোভা ফুটল ঘরখানায় বলে বোঝাতে পারব না।

মাকে ডেকে এনে দেখালাম। মা খুব খুশী। বলল, যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। এসব কাজে আর উৎসাহের অন্ত নেই। নে, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। নীরুকে আবার সাজাতে হবে তো।

তা, মা সাজিয়েছিল বটে। নীর কাকিমাকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন রাজরানী।

রানী সেজে গুজে বসে থাকলে কী হবে, রাজার তো সেই সকাল থেকেই পাত্তা নেই। এই আসে, এই আসে করে রাত বারোটা যখন বাজল, বাবা তখন বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সেই অত রাত্রে খুঁজতে বের হলেন গোপাল কাকাকে। একটু পরে ম্যানেজারকেও মা দিল পাঠিয়ে। আর গজগজ করতে লাগল ঃ একী আক্কেল বল দিকি? সারাদিন মানুষটার কোন পাত্তাই নেই। ভাল যা হোক।

রাত একটার সময় আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। মজা ফুরিয়ে এসেছে। ঘুমিয়ে পড়লাম বারান্দায়।

ঘুমের ঘোরে টের পেলাম বাবা ফিরে এলেন। একাই। পরে ম্যানেজার ফিরল। গোপাল কাকার খোঁজ নেই। ঘুমের ঘোরে তাও টের পেলাম।

তারপর অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙল।

দেখি নীর কাকিমা পাগলের মত ঠেলছে। তখন চাঁদ ঢলে আলো ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের বারান্দায়। ফুটফুট করছে।

চোখ মেলতেই সেই আলোয় দেখি এক রানী, না এক পরী, না নীর কাকিমাই। পরনে সেই ফুলশয্যের পোশাক—বাবার কেনা শাড়ি আর সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা।

কিন্তু ভয়ে চোখ মুখ চুপসে গেছে নীর কাকিমার। বললে, খোকা, শিগগির ঘরে গিয়ে শোবে চল। আমার খুব ভয় করছে। চল, নইলে আমি হয়তো মরেই যাব।

সত্যিই, নীর কাকিমা যে রকম ঠকঠক করে কাঁপছে, তাতে আমার ভয় হল, হয়তো মরেই যাবে।

সাহস দিলাম, ভয় কী, কিচ্ছু ভয় নেই। চল, শুচ্ছি গিয়ে।

আমরা দুজনে সেই ফুলশয্যেয় গিয়ে শুলাম। নীর কাকিমা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। মানুষ অত কান্না কী করে কাঁদে?

আশ্চর্য মানুষ বটে গোপাল কাকা! আমাদের বাড়িতে বউ ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেল! বাবার কাছে নাকি চিঠি লিখত মাঝে মাঝে। বাবা কাকিমাকে সাহস দিতেন। বলতেন, ভেবো না বউমা, ও রোজগারের ধান্ধায় ঘুরছে। একটা কিছু পেলেই চলে আসবে।

তারপর থেকে আমি, মা, নীর কাকিমা সব এক বিছানায় শুতাম।

সেই বিছানা থেকে একদিন নীর কাকিমা রতন মামার সঙ্গে পালিয়ে গেল। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুবার দিন দুয়েক আগে।

রতন মামাও আমাদের দূর-সম্পর্কের। নবদ্বীপে এসে দরজীর দোকান করেছিল। বেশ জোয়ান ছিল লোকটা। আমাদের বাড়িতে দু বেলা খেত। মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকত। দু-এক দিন ওর মুখে গন্ধ পেয়েছি কী রকম। হয়তো মদেরই।

নীর কাকিমা কিন্তু রতন মামাকে দেখতে পারত না। কথাবার্তাও বিশেষ বলত না।

কিছুদিন আগে রতন মামা মার কথায় আমাদের শান্তিপুর নিয়ে গিয়েছিল ভাঙা রাস দেখাতে। মা, আমি, নীর কাকিমা আর

আমার পরের বোন পরী। এই কজন। রতন মামা সঙ্গে যাবে, নীর কাকিমা প্রথমটা ইতস্তত করেছিল। মা বলল, চল, চল, অত ভাবা-ভাবির কী আছে? আজই তো ফিরব।

সেই শান্তিপুরে নীর কাকিমা হঠাৎ গেল হারিয়ে। যে ভিড়! মা আর রতন মামার মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষ ট্রেনেরও ছাড়ার সময় হয়ে এল। থাকবার উপায় নেই। ম্যানেজাবের জিম্মায় আছে কোলের খুকী।

মা খালি কাঁদে আর বলে, ও রতন, কী উপায় হবে?

বোঝা গেল রতন মামাও খুব বিপদে পড়েছে। আমাকে বললে, খোকা, তুই দিদিদের নিয়ে বাড়ি যেতে পারবি? আমি তা হলে থানা পুলিসে খবরাখবর করি।

বললাম, সে তুমি ভেবো না রতন মামা। তুমি কাকিমাকে খুঁজে আন।

রতন মামা আমাকে টিকিট-ফিকিট বুঝিয়ে দিয়ে যত্ন করে গাড়িতে তুলে দিল। গাড়িও ছেড়ে দিল। মার কান্নার আর শেষ নেই। গাড়িটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়েছে কি, আমার যেন মনে হল নীর কাকিমা। ভাল করে চেয়ে দেখি, হ্যাঁ, তাই।

চেঁচিয়ে বললাম, রতন মামা, ওই যে, ওই যে কাকিমা।

মা জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কই কই বলে।

মা দেখতে পেল না কিন্তু আমার মনে হল, রতন মামা পেয়েছে। তাই যদি না পাবে তবে দুশ্চিন্তায় গম্ভীর রতন মামার মুখে হাসি ফুটল কেন?

পরদিন ওরা বিকেলে ফিরল। মা তো খুব বকলে নীর কাকিমাকে। কিন্তু ওব যেন কী হয়েছে। মার বকুনি খাচ্ছে আর ছেলেমানুষের মত হেসে কুটোপাটি হচ্ছে।

তারপর খপ করে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, উঃ, দিদি, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। রতনদা না থাকলে কী হত?

মা মিথ্যে রাগে ধমক দিল, বুঝতি ঠ্যালা।

রাত্রে শুতে গিয়ে দেখি, নীর কাকিমার বাঁ গালে লাল দাগ। বললাম, নতুন বউ, তোমার গালে কী হয়েছে?

আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, ভিড়ে ছড়ে গেছে। নে, ঘুমো।

শেষ দিকে আমাকে তুই তুই করত। এত ভাব ছিল আমাদের দুজনের।

রতন মামা যে আমাদের সর্বনাশ করবে, বুঝতে পারি নি।

ভোর রাতে যখন গেট খুলে দুজনে বেরিয়ে যায় ওরা, তখন কিন্তু ম্যানেজার ওদের দেখেছিল। ও আমাদের ছাতে তখন শুয়ে ছিল।

ম্যানেজার কুঁই কুঁই করে বলল, আমি তো শুধোলাম, কে গো? তা বললে, আমি রতন। বললাম, যাচ্ছ কনে। বললে, দোকানে। তুই দরজাটা দিয়ে দে। তা আমি কি জানি, ওদের পেটে এত বুদ্ধি দরজা দিতি যেই নেমিছি, সেই ফাঁকে ওরা গলি পার হয়ে গিয়েছে।

ইচ্ছে হল, বোকাটার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলি, তুই ছাদ থেকে নামলি কার হুকুমে?

কিন্তু ম্যানেজারের কি কোনও বোধশোধ আছে? ও ততক্ষণে ঘ্যান ঘ্যান করছে, রতন আমারে বললে দু আনা পয়সা দেবে। ভেবেলাম তাই দিয়ে একদিন কাছিমির মাংস এনে খাব। তা ছ্যাখ, না দিয়েই পালিয়ে গেল। কী রকম সাংঘাতিক লোক বল দিকি?

কী আকাল যে দেশে এল, কী আকাল! চাল নেই, ধান নেই। ভিক্ষে বন্ধ হল। মাধুকরী মেলে না। ম্যানেজার কী করে চালায় জানি নে।

আমরা সে পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে এসেছি। মা-বোনেদের বাবা মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। রেশনের গুমো রেঙ্গুন চাল খেয়ে মার শরীর ভেঙে পড়েছিল।

বাবার রোজগার কমে গেছে। ম্যাট্রিক পাস করে আমি বাড়িতে বসে ছিলাম। এখন মেতে উঠলাম ফুড কমিটী গড়ার কাজে। বেকারত্বের জ্বালায় পাবলিক ওয়ার্কের মলম লেপতে লাগলাম।

ম্যানেজার একদিন এসে হাজির। সেই কবে এসেছিল ম্যানেজার মা থাকতে! সে প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। মা যাবার আগে ম্যানেজারকে ডেকে ভর-পেট খাইয়ে গেল। কী জানি ভবিষ্যতের কথা তো বলা যায় না, কে আছে, কে নেই!

এই তো আমার চোখের সামনেই কত জন মারা গেল। গ্রাম থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে এসেছিল, ছটফট করে মরল ক্ষিধের জ্বালায়। আমাদের সঙ্গে পড়ত হরেকেষ্ট বৈরাগী, তার জ্যাঠা গলায় দড়ি দিলেন। বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে গেল। সারা শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে। এই ডামাডোলে ম্যানেজারকে আর মনেই পড়ে নি।

ফুড কমিটীর তরফ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হল। কদিন তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যে ছটা—এই ছয় ঘণ্টা আর বিরাম পাওয়া যেত না, আমরা চালে-ডালে সাত মণ সিদ্ধ করতাম রোজ। ফুস করে উড়ে যেত। থাকত শুধু খাই খাই রব। পেট যে মানুষের কী তখন টের পেয়েছি। পেটে সইছে না, প্রায় কলেরার মত হয়েছে লোকের, লঙ্গরখানা নষ্ট করে দিচ্ছে, তবুও গবগব করে গেলার কামাই নেই। সে আজ কতদিন হয়ে গেল! কিন্তু এখনও সে দুঃস্বপ্ন স্মৃতি থেকে যায় নি।

একজনে দিনে একবার খাবে, এই ছিল লঙ্গরখানার নিয়ম। পরিমাণ ছিল মচ্ছবের হাতার তিন হাতা খিচুড়ি। কিন্তু দুবার তিনবার করে খেয়ে যায়। ওদিকে কেউ কেউ একবারও পায় না। ভাল কথায় অনেক বোঝাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু ক্ষিধে কি বুঝ মানে? তখন আমরা কড়া হলাম। ন্যাড়াদা ছিল আমাদের লীডার। দোষীকে ধরতে পারলে সে প্রথম প্রথম বের করে দিত, পরে মারধোরও শুরু করেছিল। সেদিন তাই নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়ে গেল। কজন লোক এসেছিল একটু হিংস্র ধরনের। তারা বার-কয়েক খেয়ে গেল। বারণ করলে শোনে না। ন্যাড়াদা ছিল না। আসতেই তাকে সব বললাম। এর মধ্যে তারা আবার খেতে বসেছে।

ন্যাড়াদা সটান গিয়ে তাদের খিচুড়ি ঢেলে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ক্ষুধার্ত মুখগুলো মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাই চাটতে লাগল। আর ন্যাড়াদা সমানে তাদের উপর কিল, চড়, লাথি চালাতে লাগল।

হঠাৎ দেখি, ন্যাড়াদা 'বাপ' বলে চিৎকার করে পড়ে গেল, আর তার উপর সেই ক্ষুধার্ত জনতার উন্মত্ত আক্রমণ প্রবল বেগে বর্ষিত হতে লাগল। বিপদ বুঝে আমরা ন্যাড়াদার রক্ষার জন্য এগিয়ে গেলাম। হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। চাল ডাল খিচুড়ি যা ছিল মুহূর্তে লুঠ হয়ে গেল, বেশ ঘা কতক মারও খেলাম। তারপর খবর পেয়ে পুলিস এল। জন কতককে ধরেও নিয়ে গেল।

মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি চলে এলাম। একেবারে একা। বাবা তখনও ফেরেন নি। তেল নেই, আলো জ্বলল না।

এমন সময় ম্যানেজার এল। মা চলে যাবার পর এই প্রথম।

বলল, মার চিঠি পেয়েছ ও খুকা ?

ম্যানেজারকে দেখে আবার বেশ ভাল লাগল। বললাম, আয় ম্যানেজার, বোস্।

ম্যানেজারের পিছনে ছায়ার মত আর-একজন কে এগিয়ে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে রে ?

বললে, ও হল কাঞ্চন। শ্যামবাবু মুক্তার ছেলেন, ও তাঁরই মেয়ে। বুড়ী মা আর কাঞ্চন, আর কেউ নেই ওদের। কদিন খায় নি কিছু। তাই নিয়ালাম তুমার কাছে। যদি বিহিত কিছু করতি পার।

আলোটালো নেই। ভাল দেখতে পেলাম না কাঞ্চনকে।

ম্যানেজার বলল, ভদ্দরলোকের মেয়ে লাইন দিয়ে খিচুড়ি তো খাতি পারবে না, তাই নিয়ে আলাম। বলি, চল, খুকার কাছে যাই, যদি বিহিত কিছু করতি পারে।

কাঞ্চন বলল, আপনার অনেক জানা শোনা, একটা ব্যবস্থা করতে পারবেনই।

কাঞ্চনের কথা শুনে মনে হল, বেচারা ডুবজলে গিয়ে পড়েছে।

ওর চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্ধকারে ঠাহর হল না।

ম্যানেজার বলল, খুকা যদি কিছু করতি না পারে তো আর-কেউই পারবে না।

ম্যানেজারের কথায় বিশ্বাসটা এত প্রবল ছিল যে, আমি আমার ওজন ভুলে গেলাম। বললাম, আপাতত কিছু চাল দিচ্ছি নিয়ে যাক কাঞ্চন, তারপর দেখি, কী করতে পারি।

আমাদের কিছু চাল ছিল, তাতে বড় একটা হাত দেওয়া হত না। তার থেকে আধ সের চাল দিয়ে দিলাম কাঞ্চনকে। ম্যানেজারকে দিলাম বাসি রুটি খান কয়েক। ওরা চলে গেল সেদিন।

দুদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। লঙ্গরখানা নতুন করে বসাতে হল। এবার একজন পুলিসও মোতায়েন করা হল সেখানে। ন্যাড়াদার চোটটা বেশীই লেগেছিল। বড়লোকের ছেলে। দিন কতক বিছানায় পড়ে থাকল। কাজেই চাপটা আমার উপরেই পড়ল বেশী।

কৃষ্ণনগর থেকে রিলিফ অফিসার এসেছিলেন। আমাদের পার্টির তরফ থেকে তাকে দুঃস্থ ভদ্র পরিবারদের সংকটের কথা জানানো হল। বলা হল, এরা পথে এসে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু অবস্থা চরমে উঠেছে। বহু ভদ্র, দুঃস্থ পরিবারের অনশন শুরু হয়েছে। এদের কী করে রিলিফ দেওয়া যায়? আমরা প্রস্তাব করলাম যে, এই সব পরিবারের ঘরে সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। রিলিফ অফিসার রাজী হলেন। ঠিক করা হল, এই কাজের জন্য একটা বিশেষ কেন্দ্র খোলা হবে। দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের কাব কী প্রয়োজন, আমরা লোক পাঠিয়ে তার খোঁজ নেব। তারপর প্রয়োজন অনুসারে ওই কেন্দ্র থেকে সাহায্য পাঠাব। খোঁজ নেবার লোকের কথা উঠতেই আমার হঠাৎ কাঞ্চনের কথা মনে পড়ল। আমি তার কথা বলতেই সকলে রাজী হয়ে গেলেন।

ম্যানেজার যে বাড়িতে থাকত সেখানে গিয়ে শুনি, সে অনেকদিন হল ও বাসা ছেড়ে দিয়েছে। গোবিন্দ দিঘি না কোথায় যেন এখন থাকে।

যাক কাল খোঁজ নেব ভেবে বাসায় এলাম। আমার ঘর খোলাই থাকে। দেখি কাঞ্চন বসে আছে। অন্ধকারে ছায়া দেখে ঠাহর করলাম কাঞ্চন।

বলল, অনেকক্ষণ বসে আছি।

বললাম, তোমার খোঁজেই গিয়েছিলাম। ম্যানেজারকে না পেয়ে ফিরে আসছি। দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।

কাঞ্চন বিচলিত হয়ে বলল, না না আলো জ্বালবেন না। আমি চলে গেলে জ্বালবেন।

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। বরং একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরক্ষণেই আন্দাজ করলাম। কাঞ্চনের পরনে হয়তো যথেষ্ট কাপড় নেই। তখন এসব ব্যাপার হামেশা দেখছি।

বললাম, দেখ, তোমার জন্য একটা কাজ জোগাড় করেছি। যাক সে কথা কাল বলব। কাল তুমি এই সময় এস। আমি একখানা শাড়িও জোগাড় করে রাখব।

শাড়ির কথা শুনে কাঞ্চন কেঁদে ফেলল। বললে, দিনে এই জোড়াতালি দিয়ে বেরতে পারি নে। তাই রাত্রে আসি। আপনার এখানেও আসতে পারতাম না। ম্যানেজার জোর করে সেদিন নিয়ে এল। এমন অবস্থায় পড়তে পারি, কখনও ভাবি নি।

—ও খুকা, আয়েছ ?

দেখি ম্যানেজার।

—কী রে কোথায় গিয়েছিলি ?

ম্যানেজার বলল, মাখন সা-র বাড়ি। আজ সত্যিনারাণ ছিল কি না। অনেক দিন ভাল সিন্নি খাই নি। ভাবলাম যাই। তা ভালই করেল সিন্নিটে। নারকেল কুরা আর কিস্‌মিস্‌ও দিয়েল তার মদ্ধি। তা পাতায় করে আনলাম খানিকটে। নারায়ণের দয়ায়ই তো আজ মাখন সা-র এত ঐশ্বর্যি।

মনে মনে আমি হাসলাম। এই মাখন সা আমাদের দু ক্লাস উপরে পড়ত। ফেল করে পড়া ছেড়ে ব্যবসা ধরল। ব্ল্যাক মার্কেটের রাজা হয়ে উঠল। তিন বছরের মধ্যে মাখন সা-র কত পয়সা হল! ওর লুকানো গুদামে হাজার হাজার মণ চাল। শত শত গাঁট কাপড়। আর ও এত ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি বিলোচ্ছে।

মাখন সা যাই হোক, আমার জীবনে সে কোন সমস্যাই নয়। মুশকিলে পড়লাম কাঞ্চনকে নিয়ে। রিলিফের কাজ ক-দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এতদিন তাও কোন রকমে চলেছিল, কিন্তু এখন?

আর আমার নিজেরই তখন সসেমিরা অবস্থা, অন্যকে দেখব কি।

কিন্তু কাঞ্চন তা বোঝে না। আমাকেই সে ভরসা ঠাউরেছে। আর তাছাড়া যাবেই বা কার কাছে। বিপদে পড়ে গেলাম। এই ক-দিনে কাঞ্চনের সঙ্গে মাখামাখিও বেশ হয়ে পড়েছে আমার। কিছু যে করতে পারছি নে ওর জন্যে, আমার সে অক্ষমতার ঝাল নানা ছুতোয় ওর উপরে ঝাড়ছি।

ওকে কোন কাজে লাগান যায় তাই ভেবে পাই নে। লেখাপড়া জানে না যে মেয়ে পড়ানোর কাজ জুটিয়ে দেব, হাতের কাজ শেখে নি যে সে পথে কোন রোজগার হবে।

আবার না খাওয়ার পালা চলল কাঞ্চনের। আমারও এমন কিছু সঞ্চয় নেই যে তেমনভাবে সাহায্য করতে পারি।

আর, সত্যি বলতে কি, আমি যে ওর জন্য কিছুই করতে পারব না, এ আমি ভাবি নি। তাই প্রথম দিকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, কাজকর্ম যা হোক একটা যোগাড় করা যাবেই। সেই কাজে লেগে থেকে পড়াশুনা শুরু কর। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে কাঞ্চন, খুব খাটতে হবে। বক্তৃতা ঝেড়েছিলাম।

তা, আমি যা বলেছি, কাঞ্চন তাই করেছে।

রিলিফের কাজটা সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পেরেছিলাম বলে আমার কথায় ওর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। উৎসাহের ঝোঁকে ওকে

পড়াতেও শুরু করলাম। দেড় মাসের মধ্যে কাঞ্চনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ওর বুড়ী মা আমাকে না দেখে থাকতে পারতেন না। রোজ, অনেক রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ি কাটাতাম।

কেমন এক নেশা ধরেছিল আমার। আর সে নেশা ছুটতেও বেশীদিন লাগল না।

ছ মাসের আপ্রাণ চেষ্টাতেও যখন কিছুই করতে পারলাম না, তখন কাঞ্চনকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছিল।

একদিন বললে, আমার জন্যে কিছু করতে পারলে না, এতে তোমার দোষটা কী? তুমি তার জন্যে আমাদের বাড়ি যাওয়া ছাড়লে কেন?

কেন জানি নে কথাটা আমার ভাল লাগল না। ভাবলাম, আমার অক্ষমতাকে ঠাট্টা করছে।

বিদ্রূপ করে বললাম, মুখ দেখাতে গিয়ে আর লাভ কি।

কাঞ্চন থ মেরে গেল আমার কথা শুনে। বললে, আমরা তোমায় খুব বিরক্ত করি, না। বেশ আর আসব না।

আর দাঁড়াল না? দ্বিতীয় কথা বলল না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি কতদিন ভেবেছি, যাই, কাঞ্চনের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। কিন্তু পারি নি। কাঞ্চনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাবার আগ্রহের যন্ত্রণা তিন-চার মাস আমাকে ভুগিয়েছে। তারপর তা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এসেছে।

একদিন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাঞ্চনের কথা। যে অবস্থায় ওদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি, সেই অবস্থার কথা ভেবেই আমার ভয় করছিল। কি জানি কেমন আছে?

ম্যানেজার বলল, ভালই আছে। সুখে আছে। মাখন সা ওকে রেখেছে কি না।

ধক করে আমার বুকে ঘা পড়ল। কে যেন হাতুড়ি ছুড়ে মেরেছে।

বললাম, কি বললি ?

ম্যানেজার সরলভাবেই বলল, মাখন সা লোক তো ভাল। অনেক গয়না গাঁটি দেলে। কাপড় দেলে। কাঞ্চনও বেশ ভাল মেয়ে। আমারে বললে, তুই আমার মার কাছে থাক ম্যানেজার, বুড়ো বয়সে আর কুথায় যাবি। ওখেনে থাকবি খাবি আর মাসে দুটো টাকাও দেব। মাখন সা আলাদা বাড়িতে রাখিছে কিনা। আমারে ও মাসে একখানা নতুন কাপড় দিইলো।

আমার গায়ে কে যেন আগুন ঢেলে দিল। ছিঃ। ছি ছি ছি।

একবার ভাবলাম, মাখন সা-কে চাবকে দিই। আবার ভাবলাম কাঞ্চনকে এক দলা আফিম পাঠিয়ে লিখি তুমি মর।

পরে মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে ভেবে দেখলাম, দুটো কাজেই বিলক্ষণ হাঙ্গামা হতে পারে, পুলিস পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তাই ও-সব কিছু না করে এক লম্বা চিঠি লিখলাম কাঞ্চনকে। ভাষার কশাঘাতে কাঞ্চন এবং মাখন সাকে খুবসে চাবকে মনটা অনেক সুস্থির হল। এমন কি শেষটায় একটু ভয়ও হল। ঐ যে রোখের মাথায় চিঠিতে ভাল ফিনিশ দেবার জন্যে লিখেছি, "ছি ছি কাঞ্চন তুমি মরলে না কেন?" এখন ভাবলাম, ওটা না লিখলেই ভাল ছিল। কী জানি যদি কিছু হয় ?

কিন্তু কিচ্ছু হল না। আমার কুড়িপৃষ্ঠা চিঠির জবাবে কাঞ্চন আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখলে, "আমি মরলে আমার বুড়ী মাকে খাওয়াবার ভার তুমি নেবে ? যদি নাও তো পত্রপাঠ উত্তর দিও।"

আমার চিঠির এমন চোখা উত্তর আমি আশা করি নি। আমার ভাবের বেলুন ঐ এক খোঁচাতেই ছেঁদা।

একদিন কাঞ্চনকে দেখলাম। মাখন সার সঙ্গে গাড়ি করে স্টেশনে যাচ্ছে। কাঞ্চন যে এত সুন্দর, জানতাম না।

সেই দিনই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। পরনে সুন্দর একটা রঙীন শাড়ি।

বললাম, শাড়িটা কার রে ম্যানেজার ?

বললে, কাঞ্চনের। আমারে দিয়ে গেল। কলকাতায় গেল খালাস হতি। ছেলে হবে কিনা। বড় ভাল মেয়েডা। চারডে টাকাও দিয়েছে।

টাকা আমিও ম্যানেজারকে দিলাম। দশ বছর পরে। ওর সঙ্গে দেখা হল অদ্ভুতভাবে।

গত বছরের| বন্যায় নবদ্বীপ যখন থৈ থৈ করছে, সেই সময় নবদ্বীপে গেলাম বিবরণ সংগ্রহ করতে। আমি আর আমাদের কাগজের স্টাফ ফটোগ্রাফার।

দশ বছর পরে আবার নবদ্বীপে এলাম। না, কিছুই তো প্রায় বদলায় নি শহরের। ঢপওয়ালীর মোড়ে তেমনি আছে ধর্মদার স্যাকরার দোকান, পোড়ামাতলায় বটগাছের নীচে চায়ের দোকানটি এখনও তেমনি অন্ধকার অন্ধকার।

পরিবর্তন কি একেবারে হয় নি? হয়েছে, কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে তেমন নেই। অন্তত আমার চোখে তো ঠেকল না।

অথচ কত বদলে গেল দুনিয়া! দশ বছরের মধ্যে কত কি হয়ে গেল দেশে-বিদেশে।

দেশ ভাগ হল। স্বাধীনতা এল, যুদ্ধ থামল। তৈরী হল বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জ। শান্তি শান্তি করে পাগল হয়ে উঠল পৃথিবীর লোক।

যাতে যুদ্ধ আর না বাধে তার জন্য আমেরিকা আর রাশিয়া কোমর বেঁধে মারণাস্ত্র তৈরী করতে লাগল। দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল পৃথিবী। এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলো একটা দুটো করে স্বাধীকার অর্জন করতে লাগল। হয়ে গেল বান্দুং সম্মেলন। ইউরোপ ছাড়াও যে দেশ আছে, জাতি আছে তাদের বক্তব্য আছে, বান্দুং সে কথা জানিয়ে দিল।

কত রকম ঘটনা ঘটল। আমিই কি কম বদলেছি। কত কি দেখলাম। কত কি করলাম।

এই নবদ্বীপটাকে, এর রাস্তাঘাটকে কত সমীহ করতাম এককালে!

মনে পড়ে পোড়ামাতলা থেকে বুড়ো শিবতলার গুমটি পর্যন্ত রাস্তাটুকু যেদিন পিচ ঢালা হল, সেদিন কী উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। সেদিন ওইটেই ছিল আমার সবরকম রহস্যলোকে যাবার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সেদিনকার সেই রাস্তাকে আজ মনে হয় পুচকে গলি। কলকাতাকেই এখন কত ছোট লাগে।

আজ নৌকা করে তার উপর দিয়ে ঘুরছি। খুঁটে খুঁটে খবর নিচ্ছি। জল কতদুর উঠেছিল। ঘর বাড়ি পড়েছে কিনা। ফটো তুলতে বলছি ফটোগ্রাফারকে।

আমপুলে পাড়ার কাছে এক বাড়ির ছাদে দেখি বছর দশেকের একটা মেয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমাদের ছবি তোলা দেখছে। খুব চেনা চেনা লাগল মুখখানা। কিছুতেই মনে করতে পারছি নে, কে মেয়েটি, কোথায় দেখেছি ওকে। মনেই আসছে না। অথচ মেয়েটির সব আমার চেনা। বিশেষ করে ওর ভঙ্গীগুলো। যখন এক পায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, যখন ঝুঁকে পড়ে দেখে, তখনই মনে ভাবি এ তো খুব চেনা। এই বুঝি মনে পড়ল। কিন্তু নাঃ। কিছুতেই মনে এল না। দূর, মাথাটা একেবারে গেছে।

নিজের মনেই মাথা ঠুকতে ঠুকতে চলেছি। এক সময় ফটো-গ্রাফারকে বললাম, দেখ, তুমি এবার একা একা ঘোরো। খুশিমত ছবি তোল। তারপর হোটেলে গিয়ে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। আমি একটু ভাল করে ঘুরে দেখি।

পোদ্দার বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস উঠে এসেছে। সেখান থেকে খবরাখবর নিয়ে বৌবাজারটায় চক্কর দিয়ে বাজারে যাব বলে একটা গলিতে ঢুকেছি আর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

একই রকম আছে প্রায়। এই নবদ্বীপের মত ম্যানেজারও দেখি কালকে ফাঁকি দিয়ে টিঁকে আছে। ও বোধহয় এই নবদ্বীপেরই জীবন্ত স্বরূপ।

আমি প্রথমে দেখি নি। হনহন করে আপন খেয়ালে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ শুনি, ও খুকা।

ডাক শুনে চমকে উঠলাম। ম্যানেজার না?

এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, হ্যাঁ। ওই তো ম্যানেজার, এক ঢাকা বারান্দার অন্ধকার কোণে বসে আছে। ওর পোঁটলা পুঁটলি হাঁড়ি-কুঁড়ি কিছু খোয়া যায় নি।

অথচ রানীরচড়া, রামচন্দ্রপুরে কত পয়সাওয়ালা লোক, মহাজন, যারা বাসা বেঁধেছিল, এই বন্যায় তাদের অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। ওপারে চর ব্রহ্মনগরে পাকিস্তান থেকে আসা পাঁচ হাজার ঘা খাওয়া তাঁতী পরিবার তাদের ভাঙা সংসার গুছিয়ে তুলেছিল। কী একটা কাপড়ের হাট গড়ে উঠেছিল স্বরূপগঞ্জে। মাসে লাখ আষ্টেক টাকার লেন দেন ছিল। বন্যার এক ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাদের সাজানো সংসার। কিন্তু ম্যানেজারের সেই আদ্যিকালের ফুটো মেটে হাঁড়ি আর ছেঁড়া কাপড়, ম্যানেজারের যা কিছু সম্পত্তি, এক কুচিও নষ্ট হয় নি।

ম্যানেজার আমাকে দেখে খুব খুশী, আমিও। বসে পড়লাম ওর সামনে।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলে, ও খুকা, তুমার মা কেমন আছে?

বললাম, ভাল।

আহা, তুমার মার হাতের মুচার ঘণ্ট যা খাইছি, অমন আর কুথাও খালাম না। আমারে বড্ড ভালবাসে।

বললাম, হ্যাঁ। তোর কথা এখনও বলে।

সত্যি?

বললাম, হ্যাঁ রে।

খুব খুশী হল। বলল, তুমার বুনিরা?

বললাম, ওরা এক একজন যা বড় হয়েছে। তুই চিনতেই পারবি নে।

খুঁক খুঁক করে ম্যানেজার হাসল খানিকক্ষণ। বললে, খুকার যত রগড়ের কথা। বলে চিনতিই পারব না। তাই কি হয়?

জিজ্ঞাসা করলাম, তোর খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?

বললে, না আজকাল রোজ কি খাতি পাই ? বলে, গেরস্থরাই উপোস করে থাকে।

কি জানি কেন, মনটা টনটন করে উঠল আমার। বেলা তখন প্রায় তিনটে। জলময় নবদ্বীপ। অভুক্ত ম্যানেজার। সব মিলে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। মুখ দিয়ে প্রায় আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, কী খাবি ম্যানেজার বল ? কী তোর খেতে ইচ্ছে ?

ম্যানেজারের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। বলল, জিলিপি খাওয়াবা ?

বললাম, আচ্ছা, তবে তাই নিয়ে আসি। তুই থাক। ম্যানেজারের মুখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। বলল, সত্যিই আসবা তো ?

হেসে ফেলে বললাম, হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।

জিলিপি আর অন্য খাবারও কিনলাম। ঐ সব নিয়ে ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। সেই ম্যানেজার। বিশ বছর আগে যার সঙ্গে আমার পরিচয়।

তারপর কত ঘটনা ঘটল আমার জীবনে। বিয়ে করলাম। বাসা করলাম কলকাতায়। এমন কি পুত্র-শোকও পেলাম।

সেই আমি, ম্যানেজারকে কিন্তু বদলাতে দেখলাম না। কিছু জানল না। কিছু শিখল না। কিছু করল না সারা জীবনে। পরান্ন-ভোজী হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। অপরিমেয় পরমায়ুর জোরে স্রেফ টিঁকে গেল।

অবিকল ছারপোকার মত। কোটি কোটি বছর যারা শুধু টিঁকে থেকেই রেকর্ড করে গেল।

জিলিপি, তার উপর এক ঠোঙা খাবার, ম্যানেজার খুব খুশী। ধীরে ধীরে সব গোছগাছ করে রেখে দিল।

হঠাৎ আমার কি খেয়াল চাপল। জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যানেজার তুই আমেরিকা, রাশিয়ার নাম শুনেছিস ? জানিস হাইড্রোজেন বোমা অ্যাটম বোমা কাকে বলে ? ঠাণ্ডা লড়াই কী আর কী

শান্তিপূর্ণসহ-অবস্থিতি ? ন্যাটো, সিয়াটো, কমনওয়েল্‌থ, ইউ এন ও, ইউনেস্কো…

ম্যানেজার কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। একই যুগের দুই লোক—দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা আমরা। একের ভাষা অন্যে বোঝে না। ওর জীবনে এই কথাগুলোর কোন শিকড় নেই।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল পরম কৌতুকে।

বলল, খুকার দুষ্টুমি-বুদ্ধি আর গেল না। একবার লেবেঞ্চুষির বদলে আমারে লাল নীল মোমবাতি খাওয়ায়ে ঠকাইলে, মনে আছে ? আজ বুঝি আবার নতুন প্যাঁচ ধরিছ। আমারে ঠকাতি তুমি খুব ভালবাস তা জানি। তুমি কি কম শয়তান !

ওর কথার ধরনে আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ম্যানেজার তবে এখন যাই।

হঠাৎ ওর চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, এদেশ একেবারে ছাড়ে দিলে ? তুমার মারে নিয়ে একবার আসো, কেমন ?

বললাম, হ্যাঁ, আসব একবার।

ম্যানেজার বলল, যখনই আস, আমার সাথে দেখা কোর বুঝলে। কথাটা এত সহজভাবে বলল সে, মনে হল, দশ বিশ এমন কি পঞ্চাশ বছর পরেও যদি আসি, তবু ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হবে। ওর ছারপোকা-পরমায়ু হয়ত অনন্তকাল ওকে টিঁকিয়ে রাখবে।

আমাকে উঠতে দেখে বলল, আমারে দুডো টাকা দেবা ? টাকা তো কেউ দেয় না। সে কতদিন আগে কাঞ্চন চারডে টাকা দিয়েল। কাঞ্চনরে মনে আছে তো খুকা ?

বললাম, হ্যাঁ। হঠাৎ মনে পড়ল, আমপুলে পাড়ায় যে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখলাম, সে তো কাঞ্চনের মতোই দেখতে।

ম্যানেজারের হাতে দুটো টাকা দিয়ে বললাম, কি করবি টাকা দিয়ে।

ম্যানেজার বলল, জমাব। টাকা আমি জমাই। খরচ করি নে। বলেই ম্যানেজার গোটা কতক বিবর্ণ টাকা, আধুলি, পয়সা বের করল। বলল, সব আমার চিনা। এই দেখ, এই টাকাডা একবার পুজোর সময় তুমার বাবা দিয়েলেন। সেই যেবার তুমার মা আয়েল। এই চারডে কাঞ্চনের। এই আধুলি দিয়েল নীরবালা। চেনো? মনে আছে তারে? ওর কথায় আমার নীর-কাকিমার কথাও মনে পড়ল। অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে সে ছবি। বললে, এইসব টাকা-গুলোর মন্থি তুমাদের মুখ আঁকা আছে। তাই দেখতি পাই। দুঃখু কষ্টের সময় ও-গুলো তাই নাড়াচাড়া করি। সে সব কথা মনে পড়ে। খুব ভাল লাগে।

আর সময় ছিল না। বললাম, ম্যানেজার এবার চলি।

মুখ না তুলেই বললে, আচ্ছা, আবার আসো।

আসবার সময় দেখলাম, যত্ন করে চেয়ে চেয়ে আমার টাকা দুটো দেখছে।

পরিবেশটা মেনকার আর একেবারে সহ্য হচ্ছিল না।

এই ঘর ভর্তি জনতা, তাদের অশ্লীল কৌতূহল, সামনে বসা খাকী দারোগা দুজন, ভবেশবাবুর ক্রোধান্ধ কুঞ্চিত মুখ, কোথা থেকে ভেসে আসা তীব্র এক কটু গন্ধ—পাশে বোধকরি বাথরুম আছে - এই সব-কিছুই যেন লম্বা লম্বা আঙুল বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আসছে তার দিকেই। কেন মেনকা তাও জানে। হ্যাঁ জানে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, জেনেছে, তার এখন দ্রৌপদীর অবস্থা। তার যা কিছু গোপন এরা তা এবার টেনে বের করবে। তারই উদ্যোগ সে চারদিকে দেখতে পাচ্ছে। তার লাজলজ্জা মানসম্ভ্রম হরণে সবাই যেন উদগ্রীব। সভার মাঝে চরম লাঞ্ছনার জন্য তৈরী হয়ে থাকল মেনকা।

বাড়ি থেকে—অবশ্য এখন যদি তাকে বাড়ি বলা যায়—পালিয়ে আসবার সময় যে সাহস যে উৎসাহ মেনকার সর্বশরীরে ভর করেছিল, এখন তা কোথায় উবে গেছে। বেশ ভয় করছে তার। বেশ অসহায় বোধ করছে সে। ট্রেনে বেজায় ভিড় ছিল। খুকু ছটফট করেছে সারা রাত। তার ঘুম হয় নি মোটে। সেই রাত জাগার ম্যাজম্যাজানি, মুখে হাতে জল না দেবার দরুণ একটা ঘিন-ঘিনে ভাব তো ছিলই, তার উপর পেটের ভিতর থেকে কেমন এক অস্বস্তি ঠেলে উঠছে। এক-বার বাথরুমে যেতে পারলে বোধ হয় ভাল লাগত তার। কিন্তু তার ইচ্ছের বাঁধন সব বুঝি আলগা হয়ে গেছে। তাই উঠতে আর পারল না।

সুশীল পাশেই বসে আছে। খুকু দারোগাবাবুর টেবিলের উপর তোয়ালে জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে।

কিন্তু সুশীলের উপরও এখন কেন সে আস্থা রাখতে পারছে না? মেনকা জানে, সুশীল প্রাণ থাকতে তার অসম্মান হতে দেবে

না। সুশীলের ভালবাসা যে কত তীব্র তা-ও মেনকা জানে। সুশীলের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে জীবন কাকে বলে, যৌবনের অর্থ কি মেনকা তা উপলব্ধি করেছে।

মেনকা আবার খুকুর দিকে তাকাল। অকাতরে ঘুমচ্ছে খুকু। চোখ-ভরা কাজল গালে নাকে ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো আঙুলটি মুখে পুরে ঘুমের ঘোরে চুষছে।

সুশীল আমাকে অনেক দিয়েছে। মেনকা মনে মনে বলল। কিন্তু আশ্চর্য, এখন কেন সেই সুশীলের উপরও মাঝে মাঝে ভরসা হচ্ছে না। সুশীলের দিকে মেনকা একবার চাইল। সে মুখ নীচু করে বসে আছে। বড় গম্ভীর। কিছু মতলব আছে নাকি? তাকে ফাঁসাবার? ছিঃ। নিজের মনকেই নিজে ধমক দিল মেনকা। তার কি তবে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটতে শুরু করল নাকি?

সুশীল যদি তার জীবনে না আসত তাহলে ঐ বুড়ো শকুনটা— অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার সে ভবেশবাবুর দিকে চাইল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, এত সত্ত্বেও লোকটাকে তো মোটেই শকুন বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বেজায় চটেছেন। কিন্তু ভবেশবাবু, ভবেশবাবুই আছেন। তার বেশী কিছু না, কমও না। মেনকা বলতে চেয়েছিল, সুশীল যদি তার জীবনে না আসত, তাহলে ঐ বুড়ো শকুন তার দেহটা ঠুকরে ঠুকরে খেত। এখন ভাবল সত্যিই ওসব উপমার কোন মানে হয় না। ভবেশবাবু বুড়ো, সুশীল পুরো জোয়ান। দু জনের মধ্যে তফাত আছে। কিন্তু ভবেশবাবু যখন তার দেহটাকে ঠুকরেছেন, তখন সে কোন সুখ পায় নি, কখনো পায় নি, একথা হলপ করে কি বলতে পারে? কিন্তু এসব প্রশ্নই বা এই অদ্ভুত সময়ে তার মনে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে কেন? মেনকার সে কথাও একবার মনে হল। কেন, তা সে জানে না।

বরং এখন, এই অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে, মেনকার মনে হচ্ছে, সেই অল্প সুখে তুষ্ট থাকাই ছিল ভাল। ছিঃ! মেনকা আবার নিজেকে ধমক দিল। সে কি তবে সুশীলকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে? কেন,

একথা এখন মেনকার কেন মনে উঠছে যে এই অপ্রীতিকর অবস্থার জন্য সুশীলই দায়ী ?

না সুশীল এর জন্যে বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। সে তো নিজ দায়িত্বেই বেরিয়ে পড়েছে। বরং, ঐ বুড়োটাই দায়ী। ও সব জানত। জেনে শুনে না জানার ভান করে থাকত। সুশীল আর ও বেরিয়ে আসবার পর থেকেই পিছু নিয়েছে বুড়োটা। হাওড়ায় নেমে খবর দিয়েছে পুলিসকে।

দারোগাবাবু ধমক দিলেন জনতাকে, কি দেখছেন অ্যা। কি মজা আছে এখানে ? যান, যার যার কাজে যান।

মেনকা মাথা নীচু করে বসে ছিল। চমকে উঠল দারোগাবাবুর ধমকে। মুখ না তুলেও সে বুঝতে পারল, সে ঘরে বহু লোকের ভিড় জমেছে। কে যেন পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, কথাগুলোর প্রত্যেকটি মেনকার কানে স্পষ্ট করে ঢুকল —চ, চ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। কেউ মুখ খুলবে না। সব লজ্জাবতী-লতা মেরে গেছে।

আরেকজন বললে, যা বলেছিস। কাল শালা ওসব পেপারেই পড়ব। খুব রস করে লেখে মাইরি।

মেনকার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। সেই অস্বস্তিটা বিরাট এক মোচড় মেরে মেনকাকে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিল। মেনকা ঢলে পড়ল। পড়ে যাবার উপক্রম হতেই সুশীল শক্ত হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। ভবেশবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ভবেশবাবুর সর্বশরীরে মুহূর্তের মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। একটু আগে যাকে বুড়ো শকুন বলে মেনকার মনে হয়েছিল, জ্ঞান থাকলে সে দেখত, সেই শকুন এখন এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে হয়ে উঠেছে। চোখ দিয়ে তার আগুন ছুটছে। দেহের প্রতিটি কোষ যেন রাগে গরগর করে উঠছে।

টেবিলের উপর দুখানা থাবা পেতে, সামনে একটু ঝুঁকে প্রায় গর্জন করে উঠলেন ভবেশবাবু।

খবরদার ! খবরদার তুমি ওর গায়ে হাত দিও না। নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার।

সুশীল একটুও বিচলিত হল না তাতে। পরম যত্নে মেনকাকে ধরে রইল। ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে শুধু বলল, অসভ্যতা করবেন না! তারপর দারোগাবাবুকে বলল, দয়া করে একগ্লাস জল দিন। ও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

ভবেশবাবু টেবিলে এক কিল মেরে বললেন, চোপ রও। পরস্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে জড়িয়ে ধরবার দুঃসাহস কি তোমার!

সুশীল এবারও উত্তেজিত হল না। ভবেশবাবুর দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে শুধু বলল, আপনার স্ত্রী। হুঁঃ।

তবে কার রে রাসকেল। দারোগাবাবু, ঐ বদমাশটাকে হাজতে পুরুন। আমার সর্বনাশ করে দিল।

সুশীল বলল, দারোগাবাবু এক গ্লাস জল। প্লীজ। জলদি।

দারোগাবাবু হাঁক পাড়লেন, দরোজা!

একটা কনস্টেবল এসে দাঁড়াল।

এক গ্লাস পানি। জলদি।

ভবেশবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন দারোগাবাবু তাকে শাসিয়ে দিলেন।

বললেন, চেঁচামেচি, করবেন না, ভদ্রমহিলাকে সুস্থ হতে দিন।

তা দিচ্ছি, থতমত খেয়ে ভবেশবাবু বললেন, কিন্তু দোহাই আপনার আমার স্ত্রীকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে আনুন।

ভবেশবাবু আবেগে অধীর হয়ে দারোগাবাবুর হাত দুটো চেপে ধরলেন।

দারোগাবাবু, আমি বৃদ্ধ। আপনার হাত ধরে বলছি, আপনি ওকে সরিয়ে দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি নে।

ছোট দারোগা তাঁর কাণ্ড দেখে হেসে ফেললেন।

বললেন, সরাবো কি মশাই, কার স্ত্রী, তারই তো ফয়সালা হয় নি। আপনি বলছেন, আপনার। উনি বলছেন ওনার। রগড়টি জমেছে ভাল।

ভবেশবাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমার আমার

মেনকা আমারই স্ত্রী। ওটা জোচ্চোর, পাজী, বদমাশ। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।

কনস্টেবল জল নিয়ে সুশীলের হাতে দিল। সুশীল পরম যত্নে মেনকার মুখে কয়েকটা ঝাপটা দিতেই সে চোখ মেলে চাইল। সুশীল যত্নে তার মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, মানু, ভয় কি। আমি তোমার কাছেই আছি। জল খাবে?

মেনকা কোন কথা না বলে দু-ঢোক জল খেল। তারপর তার ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে গেল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, দু হাতে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগল।

দারোগাবাবু বললেন, দেখুন, আপনাদের মধ্যে একজন কেউ মিথ্যে কথা বলছেন। আপনারা ভদ্রলোক। এসব কেলেঙ্কারীর পরিণাম কী হতে পারে, অবশ্যই জানেন। মিথ্যে বলার ফল কী, তাও আপনাদের অজানা নেই। তাই বলছি, এই ভদ্রমহিলার মান ইজ্জতের কথা ভাবুন। ঐ ঘুমন্ত নিষ্পাপ শিশুটির কথা ভাবুন, তার ভবিষ্যতের কথা—

দারোগাবাবুর সামনের টেলিফোন টিং টিং করে উঠল। তিনি ফোন তুললেন।

হ্যালো, ও ইয়েস স্যর, হ্যাঁ স্যর। এ স্যর, একটা অদ্ভুত কেস। আজ সকাল সাড়ে এগারটায় এক ভদ্রলোক, বয়স হয়েছে, জনতা এক্সপ্রেস থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম ইন্সপেক্টার কুণ্ডুর কাছে কমপ্লেন করেন যে, একটা লোক তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে। কি বললেন স্যর? ও। পাটনা থেকে। হ্যাঁ স্যর। তারপর তিনি ওদের সনাক্ত করলে, কুণ্ডু তাঁদের ধরে এনেছে। সে ভদ্রলোকও বলছেন, ও স্ত্রী আর মেয়ে তাঁরই। কি বললেন স্যর? বয়েস? বলছি স্যর।

দারোগাবাবু ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বয়েস কত?

সুশীল বলল, উনত্রিশ।

দারোগাবাবু ফোনে বললেন, স্যর উনত্রিশ'। কি বললেন, স্যর? লাভ ট্রাঙ্গেল? হাঃ হাঃ হাঃ। সেই রকমই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যর, জবানবন্দী নিতে যাচ্ছিলাম। এক্ষুনি নিচ্ছি। আচ্ছা স্যর, নমস্কার।

ফোন রেখে দারোগাবাবু বললেন, দিন মশাই, একে একে জবানবন্দী দিন। কুণ্ডু জেনারেল ডায়েরীটাতে লিখে নাও। যা সত্যি তাই বলবেন মশাই, কোন রকম হাঙ্গামা করতে চাই নে।

ভবেশবাবুকে বললেন, আপনি ফরিয়াদী, আপনারই নালিশ। আগে আপনি বলুন।

ছোটবাবু খাতা বাগিয়ে বসলেন। ভবেশবাবু বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি বলব?

বড়বাবু বললেন, সবই বলুন। আপনি কে, কি করেন, কোথায় থাকেন, আপনার পিতা কে? ওই মেয়েটা কে? ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি? সবই পরিষ্কার করে বলবেন। কিছু লুকোবেন না।

কেন লুকোব? কি লুকোবার আছে আমার? ভবেশবাবু দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন। আমার বয়স হয়েছে। আমি অধ্যাপনা করি। মিথ্যে আমি বলি নে। শুনুন।

আমার নাম ভবেশরঞ্জন মজুমদার। পাটনার ছাত্রমহলে বি আর এম। এক-ডাকে সবাই চেনে। পিতা প্রিয়রঞ্জন মজুমদার। পাটনাতেই দু পুরুষের বাস। আমাকে নিয়েই দু পুরুষ।

ভবেশবাবুর আত্মবিশ্বাস ক্রমেই যেন ফিরে আসছে। এতক্ষণ তাঁর বেশ ভয় করছিল। উত্তেজনার ঘোরে পুলিস ডেকেছিলেন। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চেঁচামেচিও বেশ করেছেন। সুশীল তাঁর এই লম্ফ ঝম্ফ দেখে অবাক হয়েছে। হয়ত হেসেছেও মনে মনে। মেনকাও অবাক হয়েছে। এমন কি তিনি নিজেও।

কেলেঙ্কারীটা হয়ত বেশীই করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আর

উপায়ই বা কী? তাঁর যে বয়স হয়েছে, তাতে এ সব হয়ত শোভা পায় না।

কেন, শোভা পাবে না কেন? আমার বয়েস বেশী, সুশীলের কম। একমাত্র এই কারণেই ছোকরা টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে? দুনিয়ার ডিক্রি কি জারি হবে শুধু যৌবনেরই অনুকূলে? বয়েসটা বেশী হয়েছে বলেই আমার স্বত্ব, স্বামিত্ব, আমার প্রেম, আমার জীবন সব খারিজ হয়ে যাবে? ইয়ার্কি! সতেজে ভবেশবাবুর চোখ দুটো চকচক করে জ্বলে উঠল।

আমার বয়েস পঞ্চান্ন। ভবেশবাবু সুশীলের দিকে একবার চেয়ে সদম্ভে বললেন, তিন মাস হল পঞ্চান্নয় পড়েছি।

কিছুমাত্র সঙ্কোচ হল না তাঁর কথাটা বলতে।

ত্রিশ বছর আগে একবার বিয়ে করেছিলাম। এক বছর না যেতেই বিপত্নীক হই। তারপর ও পথে আর পা বাড়াই নি। রসায়ন আর ল্যাবরেটারি আর ছাত্র, এই নিয়েই তেত্রিশ বছর কাটিয়েছি। কলেজ আর বাড়ি, এই ছিল আমার জগৎ। দু বছর আগে ওঁকে বিয়ে করি। মেনকা ওঁর নাম।

ভবেশবাবু আপন বিশ্বাসে ভর করে অনায়াসে এগিয়ে চলেছেন। মেনকা—এই নামটা সকালের দিকেও উচ্চারণ করতে বেশ জড়তা বোধ করছেন। কখনো প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ হয়েছে তাঁর। জ্বলে উঠেছেন এক তীব্র জ্বালায়। কিন্তু এখন তো দিব্যি বললেন। কই, বাধো-বাধো ঠেকল না তো! ভবেশবাবু দেখলেন, সুশীল আর মেনকা সাগ্রহে ওঁর কথা শুনছে। মেনকার গালে চোখের জলের দুটো মোটা দাগ চিকচিক করছে। একটু আগেই কেমন অসহায়ভাবে কাঁদছিল মেনকা। ভবেশবাবু দেখছিলেন, কান্নার দমকে শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আহা, ওর তেমন দোষ নেই। বদমাশটার কুহকে পড়ে গেছে। ব্যাটাকে জেলে পুরে ছাড়ব। মেনকা খুব লজ্জায় পড়েছে। কলঙ্কের বোঝা ওর ঘাড়ে চেপেছে। সত্যি, এত কেলেঙ্কারি করা হয়ত ঠিক হয় নি। কিন্তু উপায় ছিল না।

যে। কলকাতার ভিড়ে একবার মিশে গেলে আর কি ওদের ধরা যেত! আর যদি ধরা না যেত! না না, সে কথা ভাবাও যায় না।

দু বছর আগে আষাঢ় মাসে, বোধহয় ১৭ই আষাঢ়, আমি মেনকাকে বিয়ে করি।

বেশ জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো বললেন। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বেশ ফুর্তি লাগছে ভবেশবাবুর কথাগুলো বলতে। সুশীলের কী বলবার আছে এর পরে? বদমায়েশিটি এবার ধরা পড়ে যাবে। হাতকড়া পড়বে হাতে। সুন্দর একটা আমেজ এসে গেছে তাঁর মনে। মেনকা হয়ত তাঁর জয়ে খুশী হবে না। সুশীলের হিতেই তার আনন্দ। সে হয়ত ঘৃণাই করে আমাকে, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। একটু আগে মেনকা যখন তাঁর দিকে চেয়েছিল, তখন তার দৃষ্টিই সে-কথা ভবেশ-বাবুকে জানিয়ে দিয়েছে। মেনকা এখন তাকে ঘৃণা করে! তা করুক। ভবেশবাবু গরম হয়ে উঠলেন আবার। আরামদায়ক আমেজটি নষ্ট হয়ে গেল। ঘৃণা করে করুক। আমি অধিকার ছাড়ব না।

ভবেশবাবু শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দু বছর আগে ওকে বিয়ে করি। এক বছর পরে এই মেয়ে হয়। আর কী শুনতে চান?

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শ্বশুরের কী নাম?

শ্বশুরের নাম?

ভবেশবাবু বলতে গিয়ে থমকে গেলেন। তাই তো, মেনকার বাবার নাম তো তিনি জানেন না। কখনো তো মনেও পড়ে নি সে-কথা। প্রয়োজনও পড়ে নি তার।

কী আশ্চর্য, পুরো চার বছর এক বাড়িতে মেনকার সঙ্গে তিনি কাটিয়েছেন। কখনও তো এই নামটাকে এত জরুরী বলে মনে হয় নি।

হঠাৎ ঘাবড়ে গেলেন ভবেশবাবু। মুখ শুকিয়ে এল। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ছ্যাঁদা বেলুনের মত চুপসে গেল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

না, তিনি জানেন না। মেনকার বাবার নাম তিনি বলতে পারবেন না। মেনকার বাবার কোন অস্তিত্বই ভবেশবাবুর জীবনে ছিল না। মেনকার বাবার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ?

কেন, তিনি যে শ্বশুর। শ্বশুর! মেনকার বাবা! শ্বশুর শ্বশুর, মেনকার বাবা শ্বশুর, শ্বশুরের নাম! সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যেন। কেমন এক অসহায়বোধ ভবেশবাবুকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ভবেশবাবু বুঝতে পারছেন, কী শোচনীয় অবস্থায় পড়তে যাচ্ছেন তিনি! যে লোক এতক্ষণ জোর গলায় আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী করে চেঁচাচ্ছিল, টেবিলে চাপড় মেরে সবলে নিজের দাবি জাহির করছিল, সে একটামাত্র তুচ্ছ প্রশ্নে বেসামাল হয়ে গেল!

এখন কী জবাব দেবেন তিনি ? বুঝতে পারছেন, দারোগাবাবুর ওই ছোট্ট প্রশ্নটার জবাব দিতে তাঁর অনাবশ্যক দেরি হচ্ছে। এত দেরি হওয়া উচিত নয়। কত সময় লাগছে ? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট ? না কি ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল ?

ভবেশবাবু এ-ও বুঝতে পারছেন, সুশীল তাঁর এই অসহায় অবস্থা বেশ উপভোগ করছে। বদমাশ! বদমাশ কোথাকার! ভবেশবাবুর ঘৃণা ফুঁসে উঠতে চাইল, কিন্তু আশ্চর্য, আগের মত জোর পেল না। তাঁর মনটা যেন স্যাতাধবা স্বদেশী দেশলাই বনে গেছে। কাঠি ঠুকলেন। কিন্তু ফস্‌স্‌। আগুন আর জ্বলল না। মেনকা কী ভাবছে ? সে-ও কি খুশী হচ্ছে ? নিশ্চয়ই হচ্ছে। সুশীলের জিত, মেনকারও। আর এখন, ভবেশবাবুর মনে হল, সুশীলের জিতের পালা আরম্ভ হল। ভবেশবাবু এখন থেকে তিল তিল করে হারতে লাগবেন—যতটুকু হারবেন তিনি, ততটুকুই জিত হবে সুশীলের।

না-না না-না-না। কিছুতেই না। কিছুতেই না। কিছুতেই তিনি তা হতে দেবেন না। মেনকাকে হারাতে তিনি পারবেন না। মেনকা নেই, খুকু নেই তো সংসারও নেই। তাহলে আর তাঁর জীবনের দাম কী ? এক কানাকড়িও নয়। মেনকা আছে, খুকু আছে, তাই তিনিও বেঁচে আছেন। মেনকা তাঁর স্ত্রী। তিনি খুকুর

বাবা। বাব্ বাব্ বাব্। এরই মধ্যে কী সুন্দর বোল ফুটেছে খুকুর মুখে! আর প্রথম ডাকেই সে বাবাকে ধরেছে। বাব্ বাব্ বাব্। খুকু খুকু খুকু।

সারা ঘর নিস্তব্ধ। বড় দারোগা, ছোট দারোগা, সুশীল, মেনকা—কারো মুখেই কথা নেই। খুকুও ঘুমুচ্ছে টেবিলের উপর। একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। কথার খই ফুটছে ভবেশবাবুর মনে। মুখে তার শব্দ নেই। সারা মনের স্তব্ধতা ভেঙে কচ্ কচ্ করে নড়ছে শুধু নড়বড়ে পাখাটা।

আর ওই বিরামহীন পাখার মতই ভবেশবাবুর মগজে বয়ে চলেছে কথার স্রোত। আমার নাম ভবেশরঞ্জন মজুমদার, আমার পিতা প্রিয়রঞ্জন মজুমদার, নিবাস পাটনা, আমার স্ত্রীর নাম মেনকা, সন্তানের নাম খুকু, আমার স্ত্রীর পিতার নাম—গোটা স্রোত সারা পথ তর তর বয়ে বয়ে এই শূন্যস্থানে এসে ধাক্কা খায়, আর সব কিছু ওলটপালট খায়।

না, ওর বাবার নাম জানি নে। ভবেশবাবু একথা যদি বলেন, বলতেই হবে তাঁকে, তাঁর দাবি কেঁচে যাবে। মেনকা যে তাঁর স্ত্রী, সে কথা হয়ত বিশ্বাস করানো শক্ত হয়ে পড়বে। সুশীল হাসবে। দারোগাবাবুর অনুমতি নিয়ে ঐ স্পর্ধিত যুবক মেনকার হাত ধরে তাঁর চোখের উপর দিয়েই বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ তাঁর চেতনায় ঠক করে আঘাত পড়ল।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কী মশাই, চুপ মেরে গেলেন যে! চটপট বলে ফেলুন? আবার ওদের কথাও শুনতে হবে তো।

ভবেশবাবু ধীর নিষ্কম্প গলায় বললেন, আমার শ্বশুরের নাম আমি জানি নে।

না, সুশীল তো হাসল না! মেনকা তো উৎফুল্ল হয়ে উঠল না! এমন কি তাঁর দিকে ওরা চাইল না পর্যন্ত।

দারোগাবাবু ব্যঙ্গ করে বললেন, এতক্ষণে বেশ বোঝা যাচ্ছে—

না দারোগাবাবু।

কথা শেষ করতে না দিয়েই ভবেশবাবু বলে উঠলেন, না, আমার অবস্থা কিছুই বোঝা যায় নি। দয়া করে আমার সব কথা শুনুন।

ভবেশবাবু অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে যেন ক্ষণেকের জন্য ভুস করে ভেসে উঠলেন।

ভবেশবাবু বলতে লাগলেন, গোড়া থেকেই বলছি। চার বছর আগে মেনকা আমার বাড়িতে আসে। কলেজের এক সহকর্মী ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে আনেন। মেয়েটি নিরাশ্রয়। পাকিস্তানে দেশ। নানা আশ্রয়-শিবিরে ঘুরে পাটনায় উপস্থিত হয়েছে। একটি নিরাপদ আশ্রয় ওর চাই। তাই সহকর্মীটি ওকে আমার কাছে এনেছেন। আমি তো একা থাকি। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে একাই থাকি। দেখা শোনা সব চাকরে করে। সেকথা বন্ধুকে বললাম। বন্ধু কিছু জবাব দেবার আগেই মেনকা বলেছিল, তাতে আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

হ্যাঁ, সে কথা মেনকা বলেছিল বটে, কথাটা মেনকার মনে পড়ে গেল। শুধু কথাই নয় সেই সঙ্গে সেদিনের ছবিটাও।

মেনকা বড় নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। পরনে ছিল শতছিন্ন একটা কাপড়। পিছনে অতীত তার শূন্য। অধিকাংশ উদ্বাস্তু মেয়ের মতই। এমন কি চরম লাঞ্ছনার স্মৃতিগুলোও সেই শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানও তার কাছে এক আকার-বিহীন অস্তিত্ব মাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

এইরকম এক অবস্থায় মেনকা উপস্থিত হয়েছিল ভবেশবাবুর বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়। পুরনো। বাড়িতে ঢুকতেই মেনকার নাকে পায়রার গন্ধ লেগেছিল। আর এক ধাক্কায় তাকে নিয়ে ফেলেছিল তার গ্রামে, তাদের ফেলে-আসা বাড়ির দরদালানে। এই একই গন্ধ সেখানেও সে আকৈশোর পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেনকার অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি প্রার্থনা করতে লেগেছিল ঈশ্বরের কাছে। ভগবান, ভগবান এই বাড়িতে যেন ঠাঁই পাই। তাই ভবেশবাবু যখন তাঁর বন্ধুর প্রস্তাবে আমতা আমতা করে বললেন, এখানে তো মেয়েছেলে

কেউ থাকে না, তখন মেনকা অশোভন আগ্রহ দেখিয়েই বলেছিল, তাতে কোন রকম অসুবিধে হবে না তার।

শেষ পর্যন্ত আশ্রয় তার মিলেছিল সেখানে। কিন্তু কী রকম অদ্ভুত আশ্রয়! ভবেশবাবু পড়াশুনা নিয়েই রাতদিন মগ্ন থাকেন। ওই যে প্রথম দিন চাকরকে ডেকে বললেন, হরি, ইনি আজ থেকে এ-বাড়িতে থাকবেন, একখানা ঘর খুলে দিস, ব্যস, তারপর আর কোন খোঁজখবর নেন নি ভবেশবাবু। দেড় মাসের মধ্যে তাঁর দেখাই হয় নি মেনকার সঙ্গে।

হরি তাকে ভাল চোখে দেখে নি। ঘর সে একখানা খুলে দিয়েছিল। তবে নিতান্ত অনিচ্ছায়। আর সে কী ঘর! রাজ্যের ছবি—সেই কোন্ আমলের—ঘরের মধ্যে ডাঁই করা। একটা বড় পালঙ্ক। রঙ চটে গেছে, কিন্তু শক্ত আছে—পালঙ্কের উপর তুলোর বড় গদি। এপাশে ওপাশে ছেঁড়া। উপরে এক হাত পুরু ধুলো। ব্যস, আর কিছু নেই। মেনকার চোখে সব ভেসে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, আর কিছু সে তো চায়ও নি সেদিন। যা পেয়েছে, মনে হয়েছিল তাই ঢের।

গদির ধুলো ঝাড়ল মেনকা। ছবিগুলো দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙাল। ঘরখানা পরিষ্কার তকতকে করে ফেলল। তবুও হরির মন পেল না। হরি তাকে কোন কিছু ছুঁতে দেয় না। কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। দু বেলা দুমুঠো খেতে দেয় আর শাসায়, জিনিসপত্র ছুঁয়েছিস্ কি মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। ওসব চুরির মতলব, আমার জানা আছে।

মেনকা মহা ফাঁপরে পড়ল। এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় সে আর কখনও পড়ে নি। কাজ নেই। কথা নেই। দেড়টি মাস কথা প্রায় বলেই নি কারও সঙ্গে। বড় ভয়ে ভয়ে থেকেছে সে। পরনের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, ওতে আর লজ্জা ঢাকে না। ক-দিন ধরে হরির কাছে অনুনয় বিনয় করছে একখানা পুরান কাপড়ের জন্য। কিন্তু সে শুধু হাঁকিয়েই দিচ্ছে। অথচ কাপড় না হলেই নয়।

সেদিনটার কথা বেশ মনে পড়ল মেনকার। মরীয়া হয়ে সে ভবেশবাবুর একখানা ভিজে ধুতি পরে বসে রইল। তাই দেখে হরির কী রাগ! আর কী গালাগালই না দিচ্ছিল! হঠাৎ ভবেশবাবু খুব চটে উপর থেকে নেমে এলেন। সচরাচর এ-কাজ তিনি করেন না। তাঁর ধ্যান ভাঙানো খুব শক্ত। কিন্তু যদি একবার ভাঙে, তাহলে আর রক্ষে নেই।

নীচে এসেই চিৎকার করে উঠলেন, হরে, কী ভেবেছিস হারামজাদা! চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিস!

হরি ভয়ে গলা একেবারে নিচু করে ফেলল। বলল, বাবু, মাগীটা আস্ত চোর। ওকে বিদেয় করে দিন।

ভবেশবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কার কথা বলছিস?

মেনকা তাঁকে দেখেই ঘরে লুকিয়ে পড়েছিল। ঠক ঠক করে কাঁপছিল। ভবেশবাবু তাঁর কথা বেমালুম ভুলে গেছেন দেখে সে এবার হতভম্ব হয়ে গেল। অদ্ভুত লোক!

সত্যিই অদ্ভুত! সেদিনকার ব্যবহারও যে রকম আজকেরটাও তাই। ভবেশবাবু কত ধীর কত স্থির। গত চার বছরে এই ভব্য লোকটাকে মেনকা কখনও বিচলিত হতে দেখে নি। আর আজ সেই লোক কি ছেলেমানুষিই না করছেন! ভবেশবাবুর জন্য তার কষ্ট হতে লাগল। গত চার বছরে ভবেশবাবু যে একেবারে শিশু হয়ে গেছেন, মেনকা তা টেরও পায় নি।

সেদিনও তিনি ধমকধামক দিচ্ছিলেন হরিকে।

কার কথা বলছিস?

হরি বলল, সেই যে গণেশবাবু যাকে এনে রেখে গেলেন সেদিন। সেই মেয়েটা। বড্ড পাজি বাবু। আজ আপনার ধুতি কেচে মেলে দিয়েছি। সেই ভিজে ধুতিই পরে রয়েছে। কী সাহস বলুন দেখি!

ভবেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি মেয়ে আছে বটে। চল্ তো দেখি, ভিজে কাপড় চুরি করল কেন?

ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল মেনকার। ভবেশবাবু ঘরে ঢুকতেই

তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, নিরুপায় হয়ে আপনার কাপড়ে হাত দিয়েছি বাবু। আমার পরনের কাপড়খানা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। চোর নই।

ভবেশবাবু থতমত খেয়ে বলেছিলেন, আরে, পা ছাড়, পা ছাড়। সবই বুঝেছি। দোষটা আমারই। ছি-ছি, তোমার কাপড় নেই আমাকে একটু জানাতে হয়।

খুব কোমল হয়ে এসেছিল ভবেশবাবুর স্বর। হরিকে বললেন, এক্ষুনি বাজারে যা, এর কাপড়-জামা যা লাগে সব এনে দে। আর দ্বিতীয় কথা না বলে যেন লজ্জা ঢাকতেই ভবেশবাবু আবার উপরে উঠে গেলেন।

আর মেনকা এই প্রথম, বহু বছর পরে এই প্রথম, এমন একটা মানুষের সান্নিধ্যে এল, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। ভবেশবাবুর ওই একটি কথায় তার মনের আশঙ্কা, আতঙ্ক, দুর্ভাবনা সব দূর হয়ে গেল। সহানুভূতির একটি কোমল খোঁচাতেই সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে অনেক দিনের জমানো ভার কমিয়ে ফেলতে লাগল। আর মেনকা সেই প্রথম আবিষ্কার করল, নিশ্চিন্ত আশ্রয় না পেলে প্রাণভরে কাঁদাও যায় না।

মেনকা এও জানে, যে আশ্রয় সে পেয়েছিল তা তার আশাতীত। নিজের হাতে সে আশ্রয় সে যদি ভেঙে না দিয়ে আসত তো তা কিছুতেই ভাঙত না। ভবেশবাবু শুধু নতুন কাপড়ই দেন নি, ধীরে ধীরে যাবতীয় সংসারই মেনকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ভবেশবাবু বলছিলেন, দারোগাবাবু, মেনকা আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, যদি একথা বলি তাহলে ভুল বলা হয়, আমাকেই ও আশ্রয় দিয়েছিল। এত সেবা, এত যত্ন, আমি আর কারো কাছ থেকে পাই নি। শুকনো অঙ্ক আর শাস্ত্রের নানা জটিল ফরমুলা—এই নিয়েই ভরে ছিল আমার জীবন। তার রস গিয়েছিল শুকিয়ে। তাতে সার্থকতা

পেয়েছি। কিন্তু এবার সুখ পেলাম। বুঝলাম, নারী জীবনের কত কাম্য! পুরুষের জীবনে সে কত অপরিহার্য।

দারোগাবাবু, বিশ্বাস করুন, মেনকাকে পেয়ে আমার বয়েস কমে গেল। পলাতক যৌবন যা আমাকে ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে বঞ্চনা করে চলে গিয়েছিল, প্রাণপণে তা ফিরে আসতে চেষ্টা করল। আমার কাজের ক্ষমতা বাড়ল, কুশলতাও বাড়ল। এই সময় ১৬।১৭ ঘণ্টা কাজ করেছি ল্যাবরেটারিতে। নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে কাজ চুকোবার পর গভীর রাত্রে, যখন ল্যাবরেটারি ছেড়ে বাইরে বেরুতাম তখন দেখতাম বাইরে একটা টুল পেতে সেখানে অসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষা করে আছে মেনকা। সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যেত। মেনকা সংসারের ভার নেবার পর থেকে কখনও ঠাণ্ডা খাবার খাই নি। গোটা সংসারই ও এক কোমল উষ্ণতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল।

মেনকাকে পেয়েছিলাম। ওকে নিয়েই মগ্ন ছিলাম। ওর বাবার তো ধার ধারি নি। তাই তার নাম জানি নে। ও-ও আমাকে কখনো বলে নি। তা ছাড়া জানতাম ওর অতীত ওর কাছে খুবই পীড়াদায়ক। তাই সে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমি জীবন শুরু করেছি ওর বর্তমান থেকে। তাতে কি আমার দাবি খারিজ হয়ে যাবে?

প্রশ্নটা যেন একটা চাপা আর্তনাদ। যেন এখনই দারোগাবাবু রায় দিয়ে দেবেন সুশীলের পক্ষে। দারোগাবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। হয়ত একটা জবাবের আশায়। দারোগাবাবু কিছুই বললেন না।

ভবেশবাবু আবার শুরু করলেন, মেনকা আমাকে সব দিয়েছিল দিয়েছিল উজাড় করে। তাই আমিও ভাবলুম প্রতিদানে আমার যা কিছু দেবার আছে সবই ওকে দেব। ওকে বিয়ে করলুম। সন্তানও দিয়েছি। স্বামী, সংসার, সন্তান—সবই পেয়েছে মেনকা। এই নিয়েই তুষ্ট ছিল। থাকতও। যদি না, ওই হতভাগাটা এসে গোলমাল পাকাত। মেনকা বিগড়েছে ওরই ফুসলানিতে। ওরই প্ররোচনায় ঘর ছেড়েছে।

দারোগাবাবু, এই আমার কথা। এইবার আপনার বিচারে যা বলে করুন।

ভবেশবাবু চুপ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে বকার জন্যই হোক বা ভয় ভাবনাতেই হোক তাঁকে বেশ নির্জীব বোধ হতে লাগল।

দারোগাবাবু সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন, এইবার আপনার পালা। সত্যি কথা বলবেন মশাই।

এই সময় খুকুর ঘুম ভেঙে গেল। এক গড়ান দিয়ে উপুড় হতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সুশীল অনভ্যস্ত হাতে তাকে কোলে তুলতে গেল। খুকু তার কোলে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ তার নজর গেল ভবেশবাবুর দিকে। তৎক্ষণাৎ সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ভবেশবাবুর নাকটা ধরে বলতে লাগল, বাব্ বাব্ বাব্। ভবেশবাবু প্রবল আবেগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার সারা মুখে চুমুর পর চুমু খেলেন। তাঁর সারা গালে খুকুর চোখের কাজল লেগে গেল। কী এক পরম তৃপ্তি ফুটে উঠল সারা মুখে! চোখ দুটো চিক চিক করতে লাগল।

খুকু ভবেশবাবুর কোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কত রকম খেলা করছে। হাসছে। বাব্ বাব্ বাব্। কী মিষ্টি মিষ্টি ডাকছে ভবেশবাবুকে! সুশীল একমনে ছবিটা দেখতে লাগল। ভবেশবাবুর মনের গুমোট এর মধ্যেই অনেক কেটে গেছে। খুকুর চঞ্চল দৌরাত্ম্যে তা কেটে গেছে। ভবেশবাবুর চোখ মুখ দিয়ে বাৎসল্য যেন ঝরে পড়ছে। ভারি সুন্দর লাগল ছবিটা সুশীলের।

তার মনে পড়ল দারোগাবাবুর কথা। সত্য কথা বলবেন মশাই। সত্য সত্য করে এরা সব খেপে উঠেছে। সুশীল জানে তার সত্য ভাষণ এখানে না করবে মঙ্গল, না আনবে সুন্দর। ওর সস্তা সত্য কথায় ভবেশবাবু আর খুকুর এই স্বর্গীয় খেলাটি—হ্যাঁ, স্বর্গীয়ই বটে, সুশীল আবার চেয়ে দেখল—চিরকালের জন্য ভেঙে যাবে। সত্য কথা বলবেন মশাই। ফু! সুশীল মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। এক্ষেত্রে সত্য তো তাকে বলতেই হবে। তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বলতে হবে।

বিবেক তাকে অবশ্য মিথ্যে বলতেই প্ররোচনা দিচ্ছে। তার সৌন্দর্য-বোধ, পিতাপুত্রীর এই অনাবিল স্নেহের মালাটি ক্রুর নির্বোধ এক সত্যের আঘাতে ছিঁড়ে দিতে বিদ্রোহ করছে।

তার চেয়ে সুশীল মিথ্যেই বরং বলুক। বলুক ও মেয়ে তার নয়। ভবেশবাবুর। একবার এই রকম একটা ইচ্ছে তার মনে উঁকিও দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই তার হাসি পেল মনে মনে। এ সব মহত্ত্ব নাটকে দেখালে কোনও ঝক্কি পোয়াতে হয় না। বরং হাততালি পাওয়া যায় প্রচুর। কিন্তু এটা স্টেজ নয়। জি আর পি পুলিসের অফিস। কী যেন একটা নাম বলেছিলেন ভদ্রলোক? মিসিং স্কোয়াড্। এখানে ওসব কেতাবী মহত্ত্ব দেখাতে গেলেই হাতকড়া। তারপর সোজা শ্রীঘর।

আর এসব কথা ভাবছেই বা কেন সুশীল? তার মিথ্যে বলার ফলাফল কি সে জানে না? জেলের ভয় সুশীল করে না। তার চেয়েও মারাত্মক মেনকাকে হারানো। না, সে-কথা সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। ভবেশবাবুর প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই। অন্তত এখন। তাঁর অবস্থা সে বুঝতেও পারছে। বেচারা! বেচারা ভবেশ-বাবু! অনুকম্পা হল সুশীলের। কিন্তু মেনকার দাবি সে ছাড়তে পারে না। মেনকা তাকে প্রেম দিয়েছে। সন্তান দিয়েছে। সন্তানকে সে অবশ্য ভবেশবাবুর মত গুরুত্ব দেয় না। পিতার ভূমিকা ধাতস্থ হয় নি তার, মেনকার প্রেম তার কাছে বেশী দামী। মেনকা আছে তাই আছে তাঁর বাঁচারও অর্থ।

কী হল মশাই? দারোগাবাবু বললেন, একেবারে যে ভাম মেরে গেলেন। মুখ-টুখ খুলুন।

সুশীলের উৎসাহ অনেক নিবে গেছে। তার মনে হল, বলবার কিছু নেই। না, বলবার আছে, অনেক কিছু আছে। কিন্তু এই

পরিবেশে তা নিতান্ত হাস্যকর শোনাবে। যেমন ভবেশবাবুর কথা-গুলো শুনিয়েছে। সুশীল জানে, ভবেশবাবু এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বলেছেন, তার প্রত্যেকটি তাঁর মনের কথা। মেনকা তার জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এনেছিল, সুশীল নিজেই তার সাক্ষী। দিনের পর দিন সে তা দেখেছে। 'দারোগাবাবু, বিশ্বাস করুন, মেনকাকে পেয়ে আমার বয়েস কমে গেল।' ভবেশবাবু কী প্রচণ্ড আবেগে কথাগুলো বলে গেলেন! সুশীল জানে, একবর্ণও মিথ্যে নয় তা। কিন্তু তবু তার মনে হল, ভবেশবাবু যেন কোন আয়ুর্বেদীয় সালসার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। যা খেলে যৌবন ফিরে আসে। বার্ধক্যে হারানো কর্ম-শক্তি লাভ হয়। বেশ, শুনতে শুনতে সুশীলের মনে হয়েছিল, মেনকা তাহলে এক বোতল আয়ুর্বেদীয় সালসা!

সুশীলের কিন্তু হাসি পায় নি মোটেই। বরং ভবেশবাবুর এই আকুলি-বিকুলি তার কাছে ওষুধের বিজ্ঞাপন বলে মনে হওয়ায় সে দুঃখ পাচ্ছিল। তারপর সে দেখল খুকুর সঙ্গে ভবেশবাবুর খেলা করার দৃশ্যটি। কী চমৎকার! চোখ ভরে গেল তার। খুকু তাঁর কী, মেনকা তাঁর কতখানি, তা ভবেশবাবুর মুখ-চোখ দেখে তখন নিতান্ত একটা নির্বোধও বুঝতে পারত।

সুশীল জানে, সে যদি কিছু বলে, তার জীবনে মেনকার অস্তিত্বের গুরুত্বের কথা সে যদি 'ফিলিং' দিয়ে বোঝাতে যায়, তো তার দশাও ভবেশবাবুর মত হবে। কথায় কি মনের ভাব বোঝানো যায়?

মেনকা তার পাশে বসে আছে। তার গায়ে সুশীলের গা ঠেকছে। আর সুশীলের সর্বশরীরে বয়ে চলেছে উন্মাদ রক্তের অস্থির স্রোত। সে যদি মেনকাকে হারায়, এ-স্রোতের গতিও সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয়ে যাবে। নিমেষে তার জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়বে মিয়ানো পাঁপরের মত। কী করে এসব তাৎপর্য সে ভাষায় ফুটিয়ে তুলবে? তার চেয়ে বেশী কথা না বলে, চাঁছা-ছোলা ভাবে তার দাবিটা পেশ করা অনেক ভাল বলে সে বোধ করল।

নড়েচড়ে বসতেই মেনকার গায়ে আবার তার গা ঠেকে গেল।

তীব্র এক অনুভূতির ঝাঁজালো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে তার দেহে সাঁতার খেলে বেড়াল। সুশীলের সত্তা পুলকের স্পর্শে চাঙ্গা হয়ে উঠল। আর কোন মেয়ের স্পর্শে তো এমনটি হয় না। মেনকাকে যতবার জড়িয়ে ধরেছে সুশীল, ওর দেহের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়ে দিয়েছে নিজের দেহ, ততবারই সে অনুভব করেছে যে তার ত্বকের কোষে-কোষে রক্তের কণায়-কণায় বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সমগ্র দেহে যেন ভাঙা-গড়ার খেলা শুরু হয়েছে ভয়াবহ বেগে। প্রতি মুহূর্তে মরে, প্রতি মুহূর্তে বেঁচে সে অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে কী বলবে সুশীল ? তার ধারণা, এই হল প্রেম। জীবনকে প্রত্যহই এলোমেলো করে দিয়ে আবার সুন্দর এক সামঞ্জস্যে যা তাকে সাজিয়ে রাখে, তাই প্রেম। আর মেনকাই তাকে সে প্রেম দিতে পেরেছে। দিয়েছে দেহ-মন উজাড় করে। ফাঁকা রাখে নি, ফাঁক রাখে নি কোথাও।

যতদিন মেনকা ভবেশবাবুর আশ্রয়ে ছিল, ততদিন তারা কিছু মিথ্যার আশ্রয়, কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছিল।

কিন্তু প্রেম তার পৌরুষকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সে কেন কাপুরুষের মত ব্যবহার করবে ? তার জীবন, তার সন্তান পরাশ্রয়ে পালিত হচ্ছে, আর সে সেখানে অভিসারে যাচ্ছে চোরের মত, এই দীনতায় সে প্রতি-দিন ক্ষুব্ধ হয়েছে। এইরকম ছলনার আশ্রয় নিতে তার পৌরুষ বিদ্রোহ করেছে রোজ। কিন্তু মেনকার মুখ চেয়ে সে সব সহ্য করেছে। এ বরং ভালই হয়েছে। আজ সব প্রকাশ হবে। কিন্তু কী প্রকাশ হবে ? সত্য ? সত্যমেব জয়তে। এমন এক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে সত্যকে বোধ হয় কেউ ব্যবহার করে নি।

আমার নাম সুশীলকুমার মিত্র।—দারোগার দিকে চেয়ে সুশীল নিরুত্তাপ গলায় বলল।

পিতার নাম অমরকৃষ্ণ মিত্র। নিবাস পাটনা। আমার কথা বিশেষ বলবার নেই। আমি মেনকাকে ভালবাসি। ওই সন্তানটি আমারই।

মিথ্যে কথা।—ভবেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। খুকু ভয় পেয়ে চমকে গেল। কেঁদে উঠল। ভবেশবাবু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। খুকুর গালে মুখে চুমু খেয়ে তাকে শান্ত করলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা। এ আমার মেয়ে।

সুশীল বলল, না ভবেশবাবু (এই প্রথম সার্ না বলে সুশীল তার নাম ধরে ডাকল), খুকু আমারই মেয়ে।

ভবেশবাবু কোনও কথা না বলে অনেকক্ষণ ধরে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আবার সারা ঘরে এক অসম্ভব ভারী নিস্তব্ধতা নেমে এল। নড়-বড়ে পাখাটা যেন তার ভোঁতা ব্লেড দিয়ে কচ্‌কচ্ আওয়াজ তুলে সেই নৈঃশব্দ্য কুচিকুচি করে কাটতে লাগল। এক নিদারুণ অব্যক্ত ব্যথায় ভবেশবাবু একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। খুকুর উপর তিনি আর নজর দিচ্ছেন না দেখে সে খুঁতখুঁত করতে শুরু করল।

সুশীলই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙল। এক অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় সে অনেক হালকা বোধ করল। গত দেড়টা বছর ধরে এই একটা চাপা অস্বস্তি ঘুষঘুষে জ্বরের মত তাকে তিলে তিলে দগ্ধে মার-ছিল। আঃ, সে জ্বর এতদিনে ছাড়ল।

সুশীল বলল, আমার আর মেনকার প্রেমের চিহ্ন ওই খুকুই। আমি মেনকাকে আইনত এখনও বিয়ে করি নি, এবার করব। কলকাতায় আমরা সেইজন্যই এসেছি। এই হল আমার বক্তব্য।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ভবেশবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?

উনি আমার প্রোফেসর। মেনকার সঙ্গে আমার পরিচয় উনি নিজেই করিয়ে দেন। আমাকে বিশ্বাসও করতেন খুব। মেনকার সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার সুযোগও উনিই করে দেন।

মেনকার মনে পড়ল, হ্যাঁ, ভবেশবাবুই একদিন নিয়ে এলেন সুশীলকে। খুবই লাজুকপ্রকৃতির ছিল। ভবেশবাবু যখন বললেন, দেখ কাকে এনেছি মেনকা, তখন মেনকা চেয়ে দেখে সুশীল লজ্জায় লাল হয়ে

অন্য দিকে চেয়ে আছে। সেদিন হাসিই পেয়েছিল মেনকার। সুশীলকে সেদিন খোকা খোকা বলে মনে হচ্ছিল। ভবেশবাবু বললেন, এবার এম এস-সি পাস করেছে। কেমিস্ট্রিতে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, ফার্স্ট হতে পারে নি। সেকেণ্ড হয়েছে তাই দুঃখ। অথচ ও-ই আমার সব থেকে ভাল ছাত্র। তা আমি বলেছি, দুঃখ কী? পরীক্ষার ফল দিয়ে সব সময় মেরিট বিচার করা যায় না। কাজে নিজের ওয়ার্থ দেখাও। রিসার্চ কর আমার সঙ্গে। তা রাজী হয়েছে। এবার থেকে তোমার সংসারে আর-একটি পোষ্য বাড়ল। কথাটা বলেই ভবেশবাবু হা-হা করে এমন জোরে হেসেছিলেন যে, তার ধাক্কায় সুশীলের লজ্জা আর তার সঙ্কোচ নিঃশেষে দূর হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সেটা তখন মেনকার সংসারই বটে। সে তখন পুরো গিন্নী। ভবেশবাবুর আশ্রয়ে দু বছর আগে যেদিন মেনকা আসে সেদিন, এমন কি নিরুপায় হয়ে লজ্জা বাঁচাবার জন্য সে যেদিন ভবেশবাবুর ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে পরে সেদিনও বুঝতে পারে নি, তার কপালে কোন-দিন এত সুখ হবে, এক পুরো সংসারের কর্ত্রী সে কখনও হতে পারবে।

ভবেশবাবু তার হাতে শুধু সংসারই তুলে দেন নি, দিয়েছিলেন নিজেকেও। ধীরে ধীরে। একটু একটু করে। মেনকা আশ্রয় পেল, নিরাপত্তা পেল। আর স্বস্তি পেল। উদ্বাস্তু শিবিরের নারকীয় দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে সে মুক্ত হল। ভবেশবাবু তাকে মর্যাদা দিয়েই তাঁর সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তবুও আজ ঘণ্টা দুয়েক আগে ভবেশবাবু যে সময় পুলিস ডেকে ওদের ধরিয়ে দিলেন তখন মেনকা এ সব কথা ভুলেই গিয়েছিল। পিশাচ বলে মনে হচ্ছিল ভবেশবাবুকে। কী বিশ্রী লাগছিল তাকে!

এখন মেনকা চেয়ে দেখল। হতভম্ব ভবেশবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন সুশীলের দিকে। কখন খুকুকে কোল থেকে নামিয়ে যে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েছেন তিনি, তা বোধ হয় নিজেও জানেন না। খুকু ছটফট করছে। খুঁতখুঁত করে কাঁদতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু ভবেশবাবু নিশ্চল অথচ এই খুকুর জন্য, মেনকার মনে পড়ল, ভবেশবাবু কাজকর্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন। মেনকা বুঝতে পারল ভবেশবাবুর মনের দরজা খুকুর জন্য চিরদিনের বন্ধ মত হয়ে গেল। অথচ একে তিনি প্রায় আঁতুড় থেকেই মানুষ করেছেন। মেনকাকে কিছু করতেই দেন নি। খুকু ভবেশবাবুর নয়—সুশীলের দাবি। আর গত ন মাস ধরে কোটি কোটি মুহূর্তের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে গু-মুত ঠেলে যে ভবেশবাবু তাকে বড় করে তুললেন, তার কাছে খুকুর অস্তিত্ব সেই মুহূর্তেই খারিজ হয়ে গেল। কত সহজে!

সুশীল বলল, খুকুর জন্মের সম্ভাবনার পর থেকেই এই লুকোচুরিতে খুব বেশী করে গ্লানি বোধ করেছি। মেনকাকে কত বুঝিয়েছি। ও বুঝতে পারলেও ভবেশবাবুকে ছেড়ে আসতে রাজী হয় নি। খুকু জন্মাল। ভবেশবাবু উল্লসিত হয়ে ওকে নিজের মেয়ে বলে জাহির করতে লাগলেন। আমার পৌরুষে, আমার নীতিবোধে ঘা পড়ল। কেন এই ছলনা? আমি পিতা অথচ মেয়ের উপর আমার কোন দাবি থাকবে না? আমার উপাধি বয়ে বেড়াবে না? সারা জীবন ধরে কাটাবে একটা মিথ্যা দিয়ে গড়া জগতে? এ কী রকম কথা! আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠল। তাই মেনকাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। ওকে বিয়ে করব। আমার মেয়ে আইনগত স্বীকৃতি পাবে। তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন যার ভালবাসা পেয়েছি এবার তাকে ষোল আনা পাব।

সুশীল আরও কিছু বলত কি না কে জানে! খুকু এই সময় প্রবল কান্না জুড়ে দিল। কান্নার চোটে তার গলার শির ফুলে উঠল। সুশীল চুপ করে গেল। মেনকা তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। কিন্তু কান্না থামাতে পারল না।

অস্থির করে তুলল খুকু। কাঁদতে কাঁদতে তার শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল। সুশীল খুব বিব্রত বোধ করল। মেনকাও। সুশীল তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। চুপ চুপ, কাঁদে না কাঁদে না—বলে তার পিঠ থাবড়াল কিছুক্ষণ। কিন্তু সুবিধে

হল না। নিরুপায় হয়ে খুকুকে পাঁজাকোলা করে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। খুকুর কান্না থামল না। খুকুকে মেনকার কোলে তখন চাপিয়ে দিল সুশীল। দিয়ে বাঁচল। এর মধ্যেই তার হাঁফ ধরে গিয়েছে।

মেনকার কোলে গিয়েও কোন পরিবর্তন হল না খুকুর। সে সমানে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে চলল। মেনকা অনেক রকমে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা।

ভবেশবাবুর চেতনা যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল। সুশীলের কথা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল। ও মেয়ে সুশীলেরই। তাঁর নয়, খুকু সুশীলের মেয়ে। যেই এ কথা বিশ্বাস হল, অমনি কে যেন শক্ত শক্ত দুটো হাত দিয়ে তাঁর জীবনের উৎসটির টুঁটি টিপে ধরল। কেমন এক পঙ্গুত্ব তাঁকে অসাড় করে দিল। সব উষ্ণতা ধীরে ধীরে জমাট এক হিমে রূপায়িত হয়ে গেল। কোথা থেকে এল শান্তি। মৃত্যুর মত হিমশীতল শান্তি। কারও উপর তাঁর আর রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই। কোন কিছুতে আগ্রহও নেই ভবেশ-বাবুর। খুকুকে কোল থেকে টেবিলে নামিয়ে দিলেন। কখন, তাও তাঁর মনে রইল না। তাঁর চাঞ্চল্য, তাঁর অস্থিরতা, সব নিথর হয়ে গেল। কেউ নেই ভবেশবাবুর, কিছু নেই। জগৎটা এক অর্থহীন বিড়ম্বনা মাত্র।

খুকুর কান্নায় ভবেশবাবুর চেতনার বন্ধ দরজায় ঘা পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে কেমন এক অব্যক্ত অস্বস্তি, এক শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। খুকু খুব জোরে কেঁদে উঠল। ভবেশবাবু চমকে চেয়ে দেখলেন, মেনকার কোলে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ লাল। চোখের জল আর মুখের লালা একসঙ্গে বেরিয়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে তার। ভবেশবাবুর মন অভ্যাসবশে শশব্যস্তেই খুকুর দিকে এগিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই কে যেন এক গরম ছুরি তাঁর মর্মে বসিয়ে দিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁর মন আর্তনাদ করে উঠল। খুকু সুশীলের—সুশীলের খুকু—সুশীলের খুকু—সুশীলের—সুশীলের—

সুশীলের—সুশীলের। তাঁর মগজে কে যেন হাতুড়ি মেরে কথাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

দু হাতে মাথা ধরে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। মনে হল তাঁর মাথা বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মেনকা কিছুতেই খুকুর কান্না থামাতে পারল না। তাই সুশীল আবার তাকে কোলে তুলে নিল। এবারে অনিচ্ছায়। একটু বিরক্ত হল। কানের কাছে একটানা এই অবুঝ কান্না আর কাহাতক সহ্য করা যায়! ছোট দারোগা দু-একবার টেবিল চাপড়ে, ঠং ঠং আওয়াজ করে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা। বড় দারোগা বিরস হয়ে সুশীলকে বললেন, ওঃ. লাইফ একেবারে হেল করে দিলে! থামান মশাই, আগে আপনার মেয়েকে থামান। কাজকর্ম পরে হবে। কুণ্ডু, আমি ও-ঘরে আছি। দারোগাবাবু উঠে গেলেন।

সুশীল বিলক্ষণ রেগে গেল। দারোগাবাবুর কথায় তার অভিমান আহত হল। মেনকা বুঝতে পারল, সুশীল রেগেছে। বিব্রত হয়ে সে খুকুকে নিতে গেল। সুশীল দিল না। খুকুকে শক্ত করে ধরে দুমদাম পা ফেলে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ভবেশবাবু মুখ তুলে সব দেখছিলেন। খুকুর দাপটে মেনকা আর সুশীল দুজনেই প্রায় কাত। সুশীল রেগেছে আর মেনকা বিব্রত হয়েছে। সুশীল খুকুর বাবা আর মেনকা মা। দুজনকেই জব্দ করেছে খুকু। তিনি যা পারেন নি, খুকুই তা পারল। বাঃ, বেশ। বেশ, বেশ, বেশ। খুব মজা লাগল ভবেশবাবুর।

দেখ দেখ, সুশীলের কাণ্ড দেখ! নিজেকেই ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন। বাপ হয়েছে! আমি বাপ! নিজের সন্তানকে সামলাতে পারে না, আবার এদিকে বাপ বাপ বলে জাহির করার সময় গলাটা লম্বা হয়ে যায়।

জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না, ভবেশবাবু মনে মনেই বললেন, জন্মদানই যদি পিতৃত্বের একমাত্র গুণ হত তা হলে বাঘ-ভাল্লুকও এক-একটা পিতা বনে যেত।

খুকুকে জন্ম দেওয়া ছাড়া সুশীলের সঙ্গে তার আর কোথায় সম্পর্ক। আঁতুড়ঘর থেকে বেরুবার পর সেই যে খুকু ভবেশবাবুর কোলে পিঠে চড়েছে, আজ পর্যন্ত নামে নি। খুকু কেন কাঁদছে, মেনকাও তা ভাল জানে না কিন্তু ভবেশবাবু জানেন। খুকুর খাবার সময় হয়েছে। এই সময়ে খুকু দুধ খায়। ভবেশবাবুকেই খাওয়াতে হয়। আর কারও কাছ থেকে সে খায় না। খাওয়ার পর ভবেশ-বাবুর কোলে শুয়ে সে ঘুমুবে। আর সে সময় ছড়া বলতে হবে গুন-গুন করে। হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে। সমস্ত ছবিটা ভবেশবাবুব মনে গাঁথা।

এই যে প্রতিদিনকার খিদমত, প্রতি মুহূর্তের সাহচর্য, আশঙ্কা, আতঙ্ক, ভয় ( যদি অসুখ হয় খুকুর, যদি মরে যায় ), হর্ষ, সুখ —এ-সবের বিনিময়ে তিল তিল করে খুকুর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটা যদি পিতৃত্ব না হয় তবে পিতৃত্ব কী? ঘোড়ার ডিম?

কিন্তু তিনি কবছেন কী? ভবেশবাবু নিজেকে যেন চাবুক মারলেন। কেঁদে কেঁদে খুকুর যে ওদিকে মরে যাবার অবস্থা হয়েছে। এক্ষুনি জ্বর এসে যাবে খুকুর। বেশী কাঁদলেই তার জ্বর হয়। ভবেশবাবু সে কথা তো জানেন।

তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন সুশীলের কাছে। বললেন, দাও ওকে আমার কাছে।

সুশীল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তৎক্ষণাৎ খুকুকে ভবেশবাবুব কোলে তুলে দিল। এত সহজে ঝামেলার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায় সে ভবেশবাবুর উপর খুশীই হল মনে মনে।

ভবেশবাবু ছোট দারোগাবাবুকে বললেন, চট করে খানিকটা গবম দুধ আনিয়ে দিন।

ভবেশবাবু মেনকাকে বললেন, এই প্রথম তাঁর মেনকার সঙ্গে কথা : ঝিনুক বাটি আছে?

মেনকা বলল, আছে। ওই ছোট থলেটায়।

ভবেশবাবু চটপট ঝিনুক বাটি বের করলেন, খুকুর মুখ চোখ থেকে

জল লালা মুছিয়ে দিলেন। তারপর মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে অভ্যস্ত হাতে দুধ খাওয়াতে বসলেন। প্রথম ঢোক দুধ গিলে খুকু বিষম খেল। নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভবেশবাবু আরও সাবধান হলেন। কয়েক ঢোক দুধ গিলেই খুকুর কান্না থেমে গেল। তখন শুধু ফোঁপাতে লাগল। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে খুকুর পিঠে চাপড় দিয়ে দিয়ে গুনগুন করে ছড়া কেটে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ভবেশবাবু। যেন ম্যাজিক। দশ মিনিটের মধ্যে সব শান্ত হয়ে গেল। ভবেশবাবু টেবিলের উপর আবার তাকে শুইয়ে দিলেন। খুকু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে অকাতরে ঘুমুতে লাগল। শুধু পাখাটা খচ খচ শব্দ করে ঘুরতে লাগল।

বড় দারোগা ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন। তারপর মেনকার দিকে চোখ চেয়ে বললেন, এইবার আপনার। মেনকার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

আমার নাম মেনকা। বাবার নাম ফটিকচন্দ্র চক্রবর্তী। পাকিস্তানে বাড়ি। কুষ্টিয়ার কাছে, সেনহাটি।

মেনকা যতটা ঘাবড়েছিল, এখন ততটাই সহজ হয়ে এসেছে। বেশ বলে যাচ্ছে। কোথাও বাধল না।

ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে বলল, উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এ কথা সত্যি। শুধু আশ্রয় দিয়েছিলেন এ কথা বললে, ওঁকে ছোট করা হয়। উনি আমাকে নতুন জন্মে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওঁর কাছে যখন আসি, তখন আর আমার অবশিষ্ট কিছু ছিল না। মানুষ বলতে যদি হাড় মাংস দিয়ে গড়া একটা জীবিত অবয়ব বোঝায়, তবে তখনও আমি মানুষ ছিলাম। কিন্তু ওই অবয়বটুকুই, তার বেশী আর আমার তখন কিছু ছিল না।

ওঁর আশ্রয়ে আসবার বছর পাঁচ-ছয় আগেও আমার সব ছিল। বাড়ি, ঘর, আশা, ভবিষ্যৎ—সব। কিন্তু যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালাল, আমার কুমারী-দেহটা

বার কয়েক ধর্ষিত হল দুর্বৃত্তদের হাতে, সেদিন থেকে তিলে তিলে আমার সব গেছে।

পালিয়ে এলাম ভারতে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশা তখনও ছিল। শুনেছিলাম সীমান্ত পার হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওদিকে আশ্রয় আছে। মানসম্ভ্রমের মূল্য আছে। সীতার দেশে, সাবিত্রীর দেশে সতীধর্ম অটুট রাখবার কাণ্ডারী আছে। তাই জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এলাম পশ্চিমবঙ্গে। স্থান পেলাম উদ্বাস্তু-শিবিরে। কিন্তু সেখানেও আমার রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি। নিরুপায় হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছি। দেহ দিতে বাধ্য হয়েছি নানাজনকে।

দেহটার জন্য আর ভাবনার কিছু ছিল না। অভিজ্ঞতায় জানলাম, সে ভাবনা নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু-মেয়েদের কাছে অনর্থক শুচিবাই ছাড়া আর-কিছু নয়। তবু উদ্বাস্তু-শিবির ছেড়ে পালিয়েছি। কারণ টিঁকতে পারি নি। মৃত আর অথর্ব ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারে না।

এমনি অবস্থায় আমি ওঁর কাছে আসি। আর উনি আমাকে আশ্রয় দেন। শুধু কি বাড়িতে থাকবার ঠাঁই? না, শুধু ওইটুকুই নয়, যদিও ওটুকু পেলেই আমি বর্তে যেতাম। উনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, মর্যাদা দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন আস্ত একটা সংসার। আর সেই সংসার নিয়েই কাটিয়ে দিলাম দুটি বছর। এখন কেমন স্বপ্ন বলে মনে হয় সে-কথা।

মেনকা সুশীলের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, এই সময় সুশীল এসে হাজির হল আমাদের পরিবারে।

সেই সময় ওঁর মনে, মেনকা ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে বলল, অশান্তি দেখা দিয়েছে। আমাকে পেয়ে উনিও তখন নতুন লোক হয়ে গেছেন। প্রথম দিকে কী বিশৃঙ্খলা ছিল ওঁর সংসারে! ওঁর নিজের যেন কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে আমার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। সংসারটিই শুধু নয়। নিজেকেও। উনি

বলতেন, এতদিন লক্ষ্মীছাড়া ছিলাম। এবার লক্ষ্মী এসেছে, আর ভাবনা নেই।

সব লোক তাঁদের বিয়ে-করা স্ত্রীকেও এত সম্মান, এত প্রতিষ্ঠা, এত স্নেহ ভালবাসা হয়তো দেয় না। প্রতিদানে আমি সর্বক্ষণ চেষ্টা করতাম, ওঁকে তৃপ্তি দিতে, সুখ দিতে। উনি সুখ পেলে আমি পরম সুখে ভাসতাম।

বছর দেড়েক এমনি কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি ওঁর খুঁতখুঁতোনি বাড়ছে। এত পেয়েও ওঁর আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। সবই যদি পেলেন তবে একটা সন্তানই বা পাবেন না কেন? সন্তানের ক্ষুধা দিনের পর দিন ওঁকে গ্রাস করে ফেলল। ওর সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসল। সেই সঙ্গে আমারও। আমি অনেক রকমে চেষ্টা করে দেখলাম। শেষে বুঝতে পারলাম, ওঁর ক্ষমতায় সন্তান আমার কোন-দিনই হবে না। আবার এও ঠিক, সন্তান একটা না দিলে, ওঁর মনে শান্তি আসবে না।

ঠিক এমন মুহূর্তেই উনি একদিন সুশীলকে নিয়ে এলেন। সুশীল ওঁর সহকারী হয়ে এল। দুজনে প্রাণপণে শুরু করলেন গবেষণা। ল্যাবেরেটরি আর ল্যাবরেটরি। আর অঙ্ক আর ফরমুলা।

সুশীলের সঙ্গে আমারও এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

মেনকার মনে পড়ল সেই দিনগুলোর কথা। তিনজনের হাসি, ঠাট্টা, ছেলেমানুষিতে কী মধুরই না হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু মেনকা বলল, প্রতিরাত্রে টের পেতাম, কী তীব্র এক আকাঙ্ক্ষা কী অসহনীয় এক অতৃপ্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন উনি! ওঁর বুকটা যেন শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে পর্যন্ত সন্তানের কামনা ঝরে ঝরে পড়ছে। আমার খুব কষ্ট হল। ঠাকুর দেবতাকে কখনও ডাকি নি। এবার থেকে প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। তারপর বুঝলাম, শুধু প্রার্থনা করলেই পেটে ছেলে আসবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় সুশীলের কথা আমার মনে পড়ল।

মেনকা বুঝতে পেরেছিল, তার সংস্পর্শে এসে সুশীলের পৌরুষ জাগ্রত হতে শুরু করেছে।

বলল, ধীরে ধীরে সুশীলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করলাম। ফলও পেলাম হাতে হাতে।

ভবেশবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল মেনকা। তারপর বলল, যে রাত্রে ওঁকে জানালাম আমার বাচ্চা হবে, সে রাত্রে ওঁর কী উল্লাস! কী ফুর্তি! আমায় যেন মাথায় নিয়ে নাচবেন।

মেনকার সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। এই তার প্রথম মনে হল, সে তার বহুভোগ্য দেহটাকে এক পরম পবিত্র কাজে লাগিয়েছে। তাব নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। ভবেশবাবুর কামনা পূর্ণ করা যেন তার জন্মের ঋণ শোধ করা। ছেলে–ছেলে–ছেলে। ভবেশবাবু উল্লাসে যেন ফেটে পড়লেন।

ভবেশবাবু দ্বিগুণ ভালবাসতে শুরু করলেন মেনকাকে। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত রইল না। এই সময় মেনকাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন ভবেশবাবু। একদিন গঙ্গায় চান করে কালী-মন্দিরে এনে এক ছড়া গাঁদাফুলের মালা তার গলায় ভবেশবাবু পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, বুড়ো বয়সে টোপর পরতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে, তবে তুমি যদি বল, আমি তাও করতে রাজী আছি। আর নইলে এই বিয়েই পাকা হয়ে গেল।

মেনকা আগে হলে এতে রাজী হত কি না, কে জানে? তবে ওর অভিজ্ঞতায় ও জানে, অনুষ্ঠান থেকে নিরাপত্তা অনেক বড় জিনিস। তাই খুশী হয়েই রাজী হল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে সুশীলকেও সংবাদটা দিয়েছিল। সুশীল প্রথমটা যেন ঘাবড়ে গিয়ে-ছিল। যেন কিছু ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন মেনকা ওকে বোঝাল যে সে ওটা ভবেশবাবুর সন্তান বলে চালিয়ে দেবে, সুশীল তখন চুপ করে গেল।

কিন্তু তার পরদিনই সুশীল এসে জানাল, এমন অন্যায় সে করতে

দেবে না। তার সন্তান, তারই সন্তান। মেনকাকেও দাবি করল সুশীল। আর সে দাবির কী জোর!

সেইদিনই মেনকা বুঝতে পারল যে হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। বুঝতে পারল সুশীল তার গর্ভে সন্তানই শুধু দেয় নি, তার হৃদয়ে প্রেমেরও জন্ম দিয়েছে।

মেনকার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, এ এক আনকোরা নতুন আস্বাদ, মাধুর্যভরা এ এক নতুন যন্ত্রণা।

মেনকা বলল, গত এক বছর ধরে অনবরত এই যন্ত্রণার দাবদাহে পুড়েছি। সুশীলকে ঘিরে এই যন্ত্রণার উৎপত্তি। ওকে দেখলে আনন্দের আগুনে জ্বলি, না দেখলে দুঃখের তাপে জ্বলি। কাছে যখন আসে তখন অসহ্য এক কষ্ট ভোগ করি, দূরে যখন যায় তখনও এই কষ্ট। যেন নিদারুণ জ্বর হয়েছে আমার। সুশীলের দেখা পেলে, ওর কথা কানে গেলে সমগ্র শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। এক তীব্র অনুভূতি গর্ভ থেকে পাক খেতে খেতে উঠে আসে। অনেক দিন এ-যন্ত্রণা সহ্য করেছি। আমি প্রাণপণে ওঁর আশ্রয়, ওঁর সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেষ্টা করেছি। পারি নি। আর শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম না। উপেক্ষা করতে পারলাম না সুশীলের দাবি। আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নেই। সুশীলের উপর নির্ভর করেছি। যেখানে নিয়ে যায় যাব।

মেনকা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, প্রেমে সুখ আছে। এ কথা মিথ্যে। সুখের জন্যে কেউ প্রেম করে না। ওটা নিদারুণ ভবিতব্য। মৃত্যু যদি যম-যন্ত্রণা হয়, প্রেম তবে জীবন-যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণার আস্বাদ যখন থেকে টের পেয়েছি, সেইক্ষণ থেকেই আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। কিছু ভাবিও নে। কিছুতে আর ভয়ও পাই নে।

কী করব,' মেনকা প্রাণপণে বলে উঠল, আমার কি হাত আছে?

সত্যিই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে মেনকা। কথা বলতে গিয়ে হাঁফাচ্ছে। কথাগুলো কোনরকমে শেষ করে টেবিলে মাথা দিয়ে সে হাঁফাতে লাগল।

সুশীল ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। ভবেশবাবু চুপচাপ বসে রইলেন। কেন জানি না, তাঁর চোখ দুটো করকর করতে লাগল। দুবার রগড়ে নিলেন হাতের ওপিঠ দিয়ে। তবু সে চোখ-করকরানি থামতে চায় না।

বড় দারোগা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। যেন কর্তব্যটা মনে মনে ঠিক করে নিলেন।

তারপর বললেন, কুণ্ডু, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানেকশানটা নাও।

কুণ্ডু কানেকশান নিয়ে বড় দারোগাবাবুকে দিল। তিনি বললেন, সার্ জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। কেসটা সার বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে। কী করব সার্? ও, আচ্ছা আচ্ছা। কাল হাজির করব। আর ও দুজনকে? আচ্ছা সার্। বেশ। না সার্, ওঁরা কেউ বাজে টাইপের নন। পালাবার লোক নন। আচ্ছা সার্, নমস্কার।

ফোনটা রেখে বড় দারোগা বললেন, দেখুন, মেনকা দেবী আর তার বাচ্চাকে আমরা আজ আমাদের হেফাজতে রেখে দিচ্ছি। আপনারা দুজন কাল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে এখানে এসে যাবেন। তখন কোর্টে নিয়ে যাব। সেখানেই ফয়সালা হবে। কী বলেন?

এত রোদ পৃথিবীতে আছে, সত্যি, এ কথা যেন জানত না গৌরী। যেন আজ হঠাৎ জানল।

জানলার ধার ঘেঁষে বসে সেই যে চোখ দুটোকে বাইরে মেলে ধরেছে গৌরী, আর তাদের গুটিয়ে আনে নি। আনতে ইচ্ছেও করে নি তার।

এর মধ্যে কত মাইল যে দৌড়ে পার হল মেল ট্রেনখানা, কত স্টেশন ছিটকে ছটকে পেরিয়ে গেল, কত গাছপালা, পাহাড় বন গ্রামবসতি নদী যে বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে, তার হিসেব আর রাখতে পারে নি সে। সে শুধু লক্ষ্য রেখেছিল রোদের দিকে। ভাবছিল, কখন এই ট্রেনখানা রোদের সীমানা পেরিয়ে ঝাঁপ দেবে অন্ধকারের কোলে!

এ কথাটা ভাবতে আদৌ ভাল লাগছিল না গৌরীর। তবুও ঘুরে-ফিরে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল আর কেমন যেন ভয় ভয় করছিল তার।

ভয়, আবার অন্ধকারে ফেরার ভয়।

গৌরী জানে, এই রোদ, এই আলো, এর আয়ু বেশী নয়। এই বেলাটুকু শুধু। বেলা ফুরলেই সন্ধ্যে। বাস্, তারপর আর রাতকে ঠেকায় কে? অন্ধকারকে রোখে কে?

রাত ফুরলে আবার যে দিনটা আসবে, তার রোদ এমন ঝিলিক ছড়াবার আগেই হয়তো ট্রেনখানা হাওড়ায় গিয়ে ভিড়বে। আর তার-পর গৌরীদের কতক্ষণই বা লাগবে জেলেপাড়ার সেই রোদকানা বাই লেনে গিয়ে ঢুকতে! বড় জোর পনর মিনিট।

কাজেই, মনে মনে হিসেবটা কষে নিয়ে গৌরী স্থির করল, যতটা সময় পারা যায় এই জানলার ধারেই বসে থাকি। অন্ধগুহায় ঢোকার আগে আশ মিটিয়ে নিই রোদ দেখে দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌরী। কলকাতার মানুষ যে কী সুখে থাকে।

অথচ সেই কলকাতাতেই সাতাশ বছর কাটাল গৌরী। বাই লেনে বাই লেনে ঘুরেই বড় হল। না ছিল বাবার সঙ্গতি, না আছে স্বামীর। তাই বাই লেন ছেড়ে সদরে বাসা বাঁধার আশা করে নি গৌরী। কখনও করত কিনা সন্দেহ, যদি না বড় জামাইবাবু দিল্লি যাবার নেমন্তন্ন করতেন তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে।

শুধু পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ নয়, দিল্লি যাবার প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া, তার উপর পথে খাওয়াদাওয়া, পথখরচের জন্য আরও এক শো টাকা পাঠিয়ে বড় জামাইবাবু বিশেষ করে লিখেছেন যেতে। কোনক্রমেই যেন অন্যথা না হয়।

দিদি দশ বছর যাবৎ শয্যাশায়ী। পক্ষাঘাত। মেয়ের বিয়ের উপলক্ষে সবাইকে একবার দেখতে চান। তাই এই ব্যবস্থা।

গৌরী জীবনে কলকাতার বাইরে যায় নি। যতীনও প্রায় তাই। বিয়ের পরে একবার বুঝি দিল্লি গিয়েছিল কী এক ইণ্টারভিউ দিতে। বাস্।

কাজেই বাইরেটা যে কি বস্তু, সে সম্পর্কে গৌরীর কোন ধারণাই ছিল না। আর যতীনের ছিল ভীতি। ওরা জন্ম থেকে কুনো ব্যাঙ। অন্ধকূপের বাসিন্দা।

ছেলেমেয়ে দুটিরও ভবিতব্য তাই। বাই লেনের একতলার অন্ধ কুঠুরিতেই নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাবে ওরা। যেমন গৌরী কাটিয়ে এসেছে এতকাল। আবছায়া অন্ধকার আর ধোঁয়ার নিত্য সঙ্গী হয়ে কোনদিন ওরা এমন ডাকাতে রোদের সাহচর্য পাবে না, যেমন পায় নি গৌরী। কোনদিন ওরা বিনা বাধায় এমন আস্ত আকাশ দেখতে পাবে না, যেমন গৌরী কখনও পায় নি।

ছাতে না গেলে কলকাতার আকাশ বড়-একটা দেখা যায় না। আর ছাতটা তেতলার ভাড়াটেদের এক্তিয়ারে। একবার চন্দ্রগ্রহণ দেখবার শখ চাপায় দোতালার গিন্নীর সঙ্গে ছাতে উঠেছিল। কিন্তু

তেতলার গিন্নীর চোপার ঠ্যালায় নেমে এসেছিল তক্ষুনি, আর কখনও ছাতে ওঠার ইচ্ছে গৌরীর হয় নি। ছাতে যাব, তার জন্যে আবার অনুমতি নিতে হবে! মন কত ছোট হয়ে যায় মানুষের! ছি-ছি!

আবার ছি-ছি কেন গৌরী, ফিরছ তো সেখানেই। থাকবেও সেখানে। আচ্ছা, তুমি যদি তেতলার ভাড়াটে হতে, তুমি কি দিতে একতলার গিন্নীকে হুট করে ছাতে উঠতে? দিতে তুমি? গৌরী যেন নিজেকে দু ভাগ করে স্যাকরার নিক্তিতে তুলেছে। বাঁ দিকের পাল্লাটা ঝুলে পড়ল একটু এই প্রশ্নে আমি? গৌরী ডান দিকের পাল্লায় তোড়জোড় করে ওজন চাপাতে গেল। না, আমিও হয়তো খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে উঠতাম ওই তেতলার গিন্নার মতই। গৌরী যেন আর্তনাদ করে উঠল। সবাই আমরা অন্ধকারের বাসিন্দা। রোদ পাই নে মোটে। মনে আলো ঢুকবে কোথা দিয়ে!

মা, ওমা, ওই দেখ উট উট।

কল্যাণ একেবারে হুমাড় খেয়ে পড়ল জানলার উপর। গৌরীর বুক ছাৎ করে উঠল। টপ করে ধরে ফেলল ছেলেকে। যদি বাইরে পড়ে যেত এক্ষুনি! তখনও গৌরী থর থর করে কাঁপতে লেগেছে ভয়ে।

সামলে নিয়ে ধমক দিল গৌরী: দস্যি ছেলে, এখুনি যে পড়ে মরতিস! মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

কেয়া ওদিক থেকে ফোড়ন কাটল, দাদা দুষ্টু, না মা?

গৌরী কেয়াকে দেখতে পেল না। বলল, দাদা তো দুষ্টু বুঝলাম। কিন্তু তুমি কোথায়, কী করছ? দেখি, এস তো এদিকে।

খুকু আসতেই তাকে দেখে গৌরীর তো চোখ কপালে উঠল।

করেছিস কী রাক্ষুসী? অ্যাঁ, জামা ভিজোলি কী করে? ওগো, দেখছ, দেখ তোমার মেয়ের কাণ্ড!

যতীন একটা বেঞ্চিতে বসে আরাম করে বই পড়ছিল। মুখ থেকে বই না সরিয়েই হাঁক দিল, রাক্ষুসী!

খুকু বলল, লাখকুশি না, আমি ঝি। আমি ঘর ধুই।

যতীন আর গৌরী জবাব শুনে হেসে ফেলল।

যতীন বলল, তুমি ঝি? বাঃ, বেশ। আবার হাসল।

গৌরী চটে গেল। ওর মনে হল, এরা সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে ওকে রোদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। ইচ্ছে হল খুকুকে দুটো থাপ্পড় দিয়ে দেয়। ডাকল, এদিকে আয়।

খুকু বলল, না, ঝি, ঘর ধুই।

আর ঘর ধুতে হবে না। আয় এদিকে।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, উটেরা কী খায়?

জানি নে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কর।

ট্রেনের গতি কমে আসছে।

যতীন জিজ্ঞাসা করল, কী গো, কিছু খাবে নাকি? চা-টা দিতে বলি, কী বল? ট্রেনে ক্ষিধেটা দেখছি বেশ পায়।

গৌরী বলল, তাই নাকি! তা হলে এস, একটা মাস টিকিট কিনে ট্রেনেই থেকে যাই। বাড়িতে তো কিছু খাওয়াতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

যতীন হাসে। স্টেশনের হৈ-হট্টগোলে গৌরী তখন মেতে গেছে। কতরকম লোক এই কদিনে সে দেখে ফেলল। কত বিচিত্র পোশাক, কত বিচিত্র ধরনের কথাবার্তা! গৌরী মাঝে মাঝে যেন খেই হারিয়ে ফেলে।

দিল্লি ওরা গিয়েছিল গাড়ি রিজার্ভ করে। একখানা গোটা কামরা, হোক না ছোট্ট, ওরা পেয়েছিল। বাইরে কার্ড ঝোলানো ছিল; প্রোফেসার জে চৌধুরী অ্যাণ্ড ফ্যামিলি। সারাপথ কেউ ওদের গাড়িতে ওঠে নি। সে ভালই লেগেছিল গৌরীর। ওদিকের কামরাগুলোয় যা ভিড়, অমনভাবে এলে সে বোধ হয় মরেই যেত। তখন ট্রেনে চড়তেই ভয় পেয়েছিল। কী জানি, ট্রেন উল্টে-টুল্টে যায় নাকি! ছেলেমেয়ে দুটো যা দস্যি, পড়ে-ফড়ে না যায়! এমন কত ভয় যে ওর ঘাড়ে চেপেছিল, তার হিসেব নেই। প্রথম রাতটা তো ঠায় জেগে কাটিয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটেছে। মজা লেগেছে। ট্রেন-জার্নির মজা। স্টেশন আর লোক দেখতে দেখতেই তারা পৌঁছে গেছে দিল্লি।

কত কী যে দেখবার বাকী ছিল, এখন টের পাচ্ছে গৌরী। এখন, এই ফিরতি পথে, আর যখন মোটে সময় নেই হাতে।

এ যেন এক নতুন জন্ম গৌরীর।

চুপচাপ বসে চলন্ত যান থেকে জগৎ দেখায় যে এত সুখ, স্বপ্নেও সে কখনও ভাবে নি।

দিল্লি পৌঁছে, বিয়ে-বাড়ির হৈচৈ নিয়ে কদিন মেতেছিল গৌরী। বড়লোকের বাড়ি দূর থেকেই তার দেখা। থাকে নি কখনও। দিদির বাড়ির ঐশ্বর্যে তাই সে হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। প্রথম দু-চারদিন তার আড়ষ্ট মন লাগাম টেনে টেনে চলেছিল। কিন্তু দিদি-জামাইবাবুর ব্যবহারে সহজ হতেও সময় লাগে নি তার। আর যে মুহূর্ত থেকে সে মনের রাশে ঢিল দিল, সেই তখন থেকেই গৌরী এক নতুন সুখের পাথারে ডুবে গেল। ডুবে রইল কদিন।

দিদি তার চেয়ে অনেক বড়। সে যখন নিতান্ত ছোট, তখন দিদির বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবুর অবস্থা কেমন তা বোঝার বয়েস গৌরীর ছিল না। গৌরীর সে বয়েস যখন হল তখন দিদি জামাই-বাবু কলকাতায় আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝে মাঝে খবর পেয়েছে দিল্লি-সিমলা ছুটছেন তাঁরা। সেটা যুদ্ধের শেষ সময়। জামাইবাবু সস্তাদরে ডিসপোজালের মাল ধরে রাখছেন। সে সময় একবার কলকাতাতেও এসেছিলেন। বড় হোটেলে উঠেছিলেন দিদিকে নিয়ে। একদিন সময় করে খেতে এসেছিলেন তাঁরা, গৌরীর সে কথা মনে আছে। ওদের গলিতে ট্যাক্সি ঢোকে নি বলে জামাইয়ের কাছে মার কী আফসোস! গৌরীকে দেখে জামাইবাবু কিন্তু খুব খুশী হয়েছিলেন। একদিন সিনেমা দেখিয়েছিলেন। শাড়ি-ব্লাউজ আর গয়নাও কিনে দিয়েছিলেন জামাইবাবু।

গৌরীর বিয়ের সময় জামাইবাবু বিলাত গিয়েছিলেন দিদির চিকিৎসা করাতে। আগের বছরই দিদির পক্ষাঘাত হয়। বাঁ অঙ্গ একেবারে অবশ।

বাবা আর মা দু বছরের ব্যবধানে যখন মরলেন, তখন তো দিদি শয্যাশায়ী। জামাইবাবু ব্যবসায় ব্যস্ত। আসতে পারেন নি ওঁরা, তবে শ্রাদ্ধের খরচ ঠিকমতই পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণ কেয়া জন্মাবার পর, প্রত্যেকবার দিদি ওদের জামা, পুজোয় টাকা পাঠিয়েছে। অনেকবার যেতেও লিখেছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি।

এইবার গৌরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার দিদির সংসার। কী বিরাট ব্যাপার! সিনেমাতে বড়লোকের বাড়ি যেমন দেখায়, তার চেয়েও সুন্দর। তার চেয়ে অনেক ভাল।

না, বাঁচার হলে এমনিভাবে বাঁচ। সে সব কথা কতবার যে গৌরীর মনে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গরমে ঠাণ্ডায় ওম করা জলের মসৃণ টবে গলা ডুবিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে সুগন্ধি সাবানে গা ঘষতে ঘষতে ও-কথা বহুবার মনে হয়েছে। বাথরুমের বড় আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে গৌরীর বার বার মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এই তো বাঁচা।

এ কদিনেই গৌরী অনেক উদ্ভট শখ মিটিয়ে নিয়েছে। এ-রকম সুন্দর আর নির্জন বাথরুম পেলে মেয়েমের যে-সব শখ মাথায় চাপে, তা মিটিয়ে নিয়েছে গৌরী। আদুড় গায়ে বাথটবে গলা ডুবিয়ে সাবান মেখেছে ঠাণ্ডা-গরম জলে। জলসিক্ত চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক-দিন টুপ করে দেখেও নিয়েছে আয়নায়। আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে। এই কি গৌরী নাকি! এত সুন্দর সে!

গৌরীর চেহারা সত্যিই খুব সুন্দর। জামাইবাবু বলেন, দিদিরও নাকি ওই রকম চেহারা ছিল। দিদি সাজতে ভালবাসত। সে শখ গৌরীকে পেয়ে মেটাল। নিজের সে-আমলের শাড়ি-গয়না দিয়ে রোজ সাজাত। লজ্জা পেত গৌরী। যতীন ঠাট্টা করত, আরে বাপ,

এ যে দেখছি রাজরানী! কিন্তু যতীনের চোখ দেখে গৌরী বুঝত, তার ভাল লেগেছে। নিজেও খুশী হত।

কল্যাণ কেয়াও যখন হাঁ করে চেয়ে থাকত তার দিকে, তখন গৌরী ছুট দিত দিদির ঘরে।

কল্যাণ বলত, তোমার বিয়ে হবে, না মা?

হো-হো করে হেসে উঠত সবাই। জামাইবাবু বলতেন, যতীন ভায়া, সামলে। আমার গিন্নীর পোশাকে ওকে দেখলে নকলে আসল বলে ভ্রম হচ্ছে। কিছু ঘটে যেতে পারে।

গৌরী চটে গিয়ে সব খুলে ফেলত। কিন্তু সাধ্যসাধনা করে আবার সবাই তাকে সাজাত।

মঞ্জুই একমাত্র মেয়ে দিদি-জামাইবাবুর। কিন্তু দেখতে তত ভাল নয়। তাই সে মোটেই সাজগোজ করতে চায় না।

সবাই এখন গৌরীর উপর দিয়ে নিজের শখ মিটিয়ে নিচ্ছে।

সত্যি বলতে কী, প্রথম প্রথম গৌরী খুব বিব্রত বোধ করত। সাজপোশাক সে বড়-একটা করত না। সঙ্গতিও ছিল না তার।

তাই দিদির প্রস্তাব শুনে সে লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। রাজী হয় নি। কিন্তু অসুস্থ পঙ্গু লোকেব ইচ্ছেটা পূরণ করবার জন্য সবাই যখন তাকে ধরে বসল, বিশেষ করে মঞ্জু, তখন সে আর 'না' বলতে পারল না। রাত্রে যতীন যখন তার প্রশংসা করল তখন খুব খুশী হয়েছিল গৌরী। তারপর তার যেন কেমন নেশা ধরে গিয়েছিল। কী এক সুখের আবেশে শরীর ভরে যেতে লাগল তার। কেমন মনে হতে লাগল, এ স্বপ্ন, এ স্বপ্ন।

দিদি সব তাকে দিয়ে দিয়েছে। এক বাক্স গয়না। বহু শাড়ি। দামী দামী। গৌরী কিছুতেই নিতে চায় নি। দিদি কেঁদে-কেটে জোর করে এগুলো নিতে তাকে বাধ্য করেছে।

ফিরতি পথে এই এক অস্বস্তি গৌরীর। ট্রেনে উঠে অবধি গয়নার ভাবনায় সে শঙ্কিত হয়ে রয়েছে। চুরি যায় কি ডাকাতি হয়, কে জানে? তার উপর এক দুশ্চিন্তা, এবারে আর রিজার্ভেশন পাওয়া

গেল না। ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকিট। ওদের কামরাটাও ছুটো স্টপ পরে ফাঁকা হয়ে গেল। তবু ভয় গেল না গৌরীর। এত টাকার জিনিস নিয়ে ভালয় ভালয় পৌঁছলে বাঁচি।

রাত কেটেছে অস্বস্তিতে। যতীন নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিয়েছে। ছেলেমেয়েরাও ঘুমতে কিছু কসুর করে নি। শুধু ঘুম আসে নি গৌরীর চোখে। নানা দুশ্চিন্তা, নানা অস্বস্তি লক্ষ সূচের হুল ফুটিয়েছে সারা রাত। এমনিভাবে রাত কেটেছে তার। তারপর যেই আলো ফুটতে লাগল বাইরে, শূন্য বেয়ে আলোর কণা পাখা মেলে মাটিতে নামতে লাগল, গৌরীর মনের ভয়ও ঝরে পড়ল শীতের পাতার মত।

আলো—আলো—আলো। দিনের আলো। আঃ! গৌরী যেন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছে এখন।

জীবনে এই প্রথম গৌরী ভয়হর দিনকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখল।

ট্রেনখানা তখন এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। দিনের আবির্ভাবে রাত্রির ষড়যন্ত্র বানচাল হতে আরম্ভ করেছে। মাঠের উপরকার থোকা থোকা কুয়াশার মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আর—

ওই যে, আরে বাঃ! গৌরীর চোখে পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত।

ওই যে, একটা ন্যাড়া পাহাড়ের কাঁধের উপর হঠাৎ কোত্থেকে আবির্ভাব হল শিশু সূর্যের!

গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সূর্যস্তোত্রটা। ওর ছোট-বেলায় বহুবার শুনেছে বাবার মুখে। সেই মুহূর্তেই গৌরীকে কে যেন হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে দিল কুড়ি-একুশ বছর আগেকার জীবনে। ভিজে-ভিজে শীতের ভোরে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে। বাবা সেই ভোরেই স্নান সেরে কাঁপা কাঁপা হেঁড়ে গলায় আবৃত্তি করে চলেছেন—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্...." জবা-কুসুমই বটে। গৌরী পলকহীন চোখে দেখল, জবাকুসুম। হ্যাঁ, জবাকুসুম।

কলকাতার জেলেপাড়া বাই লেনের একতলার সেই শীত-সকালের

কুঠরিতে তার বাবা সারাজীবন 'জবাকুসুম' মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর চোখেও সূর্যের এ চেহারা কখনই ধরা পড়ে নি।

গৌরীর কি সুকৃতির ফল ছিল, কে জানে? নিজ চোখে আজ সেই রূপ দেখল সূর্যের।

দেখল. রোদ কত বড় হয়।

ওদিকের যে-দিগন্তের কোল ঘেঁষে রোদ নেমেছে, সেখান পর্যন্ত ভাল নজর যায় না গৌরীর। আবার তেমনি এক দিগন্তে গিয়ে চোখ ঠেকে তার—ওই আর-এক দিকে, সেখানেও লুটোপুটি খাচ্ছে অজস্র রোদ। গৌরীর নজরে জগৎটাকে যত বড় লাগে, রোদও ঠিক ততটাই বড়।

একটু একটু করে বেলা বাড়ে, আর গৌরীর মনে নানা রঙ ধরে। অপূর্ব পুলকে তার শরীর ভরে ওঠে। এ সুখ পরিচিত নয় তার।

তার দৈনন্দিন জীবনে ছায়া যেন বেশী। অন্তত তাই তার মনে হচ্ছে এখন। কলকাতার ঘরে দুপুর গড়িয়ে যাবার মুখে উত্তর দিকের গলিটা থেকে তার ঘরে একটুক্ষণের জন্য পাণ্ডুর রোদ উঁকি মেরে যায়। সে রোদ পুরো একটা ঘরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে না। দক্ষিণের দেওয়ালে যতীনের বইয়ের তাকটা যেখানে, সেখানে একটা ছোট্ট টিক মেরেই সাত তাড়াতাড়ি পালায়। গৌরীর আজ মনে হল, তার রোজকার জীবনেও আলো আসে কম। তাই রোদের এই বেহিসেবী প্রাচুর্য দেখতে দেখতে তার প্রাণে নেমে এল অজানা আনন্দের ঢল।

গত রাত্রের জেগে থাকার অস্বস্তি, গহনার জন্য উদ্বেগ, এমন কি দিদির বাড়ির অনাস্বাদিতপূর্ব সুখও ভেসে গেল। এখনকার এই নতুন আনন্দের জোয়ারে।

মাঝে মাঝে স্টেশনে স্টেশনে থামতে লাগল গাড়ি। বেলা বাড়তে লাগল। মুখ হাত ধুয়ে গৌরী প্রাতঃকৃত্য সারল, ছেলেমেয়ে, যতীনকে খাওয়াল বারকয়েক, নিজেও খেল। তারপর জানলায় এসে বসল। কিন্তু সবই সে করল যেন নেশার মধ্যে।

যতীন বলল, কী গো, চানটান করবে নাকি? সামনের স্টেশনে কিন্তু খেতে দেবে। বলা আছে।

চান করতে কল্যাণ কেয়ার দুজনেরই সমান আপত্তি। ওদের চান করাতে গৌরীর প্রায় অর্ধেক আয়ুই ক্ষয় হয়ে যায়। তবু সে ছাড়ে না কোনদিন।

স্নানের নাম শুনেই মুখ শুকিয়ে এল ওদেরঃ না মা, চান করব না। কল্যাণের সঙ্গে কেয়াও গোঁ ধরল। আজ আর গৌরী জোর করল না।

একটু হেসে বলল, থাক্ তবে, আজ আর চান করতে হবে না। চল্, তোদের হাত-মুখ ধুইয়ে দিই ভাল করে।

যতীনকে বলল, ওগো, এদের নিয়ে বেরুলেই তুমি ঢুকো।

তারপর তিনজনে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। এ বাথরুমটা বেশ বড়-সড়। পরিষ্কারও। আয়নাটা বেশ চকচকে। গাড়িটা বোধ হয় নতুন। গামছায় সাবান মাখিয়ে গৌরী ওদের মুখ-হাত আর গা রগড়ে দিল। তাতেই যা কাঁইবাই শুরু হল, গৌরী অস্থির।

ভয়ানক দুরন্ত হয়েছে দুটো। ফিরে গিয়ে কল্যাণকে ইস্কুলে পাঠাতে হবে। না হলে গৌরী আর সামলাতে পারে না।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। খটাখট শব্দ হচ্ছে চাকায়। এদিকে ওদিকে টাল খাচ্ছে গাড়ি। তার মানেই একটা বড় স্টেশন আসছে। ছেলেমেয়েকে কাচা জামাকাপড় পরাতে-না-পরাতেই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেল গাড়ি। ওরা বেরিয়েই এসে গদিতে বসেছে কি, উর্দিপরা বেয়ারা এসে প্লেট-ঢাকা খাবার দিয়ে গেল। সঙ্গে গ্লাস প্লেট কাঁটা চামচ। যাবার পথেও ওদের এমনি করে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন গাড়ির খাবার দেখে খুঁতখুঁত করেছিল গৌরী। কাঁটা-চামচ দেখে ঘেন্না লেগেছিল তার। খাবার সময় একটু বমি-বমি ভাবও না লেগে-ছিল এমন নয়। এবারে কিন্তু তেমন কিছু মনে হল না। বরং চক-চকে ঝকঝকে বাসনপত্র দেখে খুশীই হল গৌরী। মনে মনে ওদের পরিচ্ছন্নতার তারিফও করল।

তারপর হঠাৎ সেই উদ্ভট ইচ্ছেটা মাথা-নাড়া দিয়ে উঠল। দেখব নাকি আজ কাঁটা-চামচেয় খেয়ে! কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল গৌরী। চনমন করে চাইল চারদিকে। না, যতীন নেই। বাথরুমে ঢুকেছে। কেউ টের পায় নি তার মনের ইচ্ছেটা। পাগল নাকি গৌরী?

কেয়াকে ধাক্কা মেরেছে কল্যাণ। কল্যাণের হাত কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে কেয়া। দুজনের চেঁচানিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম।

গৌরী মুহূর্তের মধ্যে জেলেপাড়া বাই লেনের গৌরী হয়ে গেল।

হাড় জ্বালিয়ে খেল শত্তুর!

গুম গুম কিল পড়ল ওদের পিঠে। অভ্যস্ত নিয়মে। দুজনে একটু কাঁদল। গৌরী ওদের চোখ-মুখ মুছিয়ে আদর করল একটু। তারপর দুজনকে সাবধানে খাইয়ে দিতে লাগল।

যতীন স্নান সেরে বেরিয়ে দেখে, কল্যাণ কেয়ার খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে। ওরা বেঞ্চে বসে পাখি দেখছে টেলিগ্রাফের তারে।

যতান আর গৌরী একসঙ্গে খেতে বসল।

যতীন বলল, ভায়রার পয়সায় দিব্যি নবাবি করা গেল।

গৌরী বলল, যা বলেছ। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, এমন আরামে ফার্স্ট ক্লাসে রেল চড়ব কোনদিন। কিন্তু কী মন দেখ, টাকা পাঠালেন জামাইবাবু, টিকিট কাটলে তুমি। আর আমি এদিকে মরি বেহিসেবী টাকা খরচের শোকে। কতবার যে ভেবেছি, থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনতে বলি তোমায়। কম টাকা বাঁচত!

যতীন বলল, ছি, তাই কি হয় নাকি? টাকা দিলেন তাঁরা আরামে যেতে, আর আমরা ভিড়ের গুঁতোয় চেপ্টা হয়ে যাব, ওরা কী ভাবতেন!

তাই তো বলছি গো—গৌরী প্লেট সাজাতে সাজাতে বলল, সে তো তুমি ঠিকই করেছ, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছ। আমি বলছি, আমার মনের কথা। যদি বা চড়লাম একলাফে ফার্স্ট ক্লাসে। তাও পরের পয়সায়। কোথায় খুশিতে ফেটে পড়ব, তা নয়; অপব্যয় হচ্ছে ভেবে মনটা খচখচ করেই মলো।

গৌরীর কথা শুনে যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু বোধ হয় অবাকই হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই হেসে ফেলল।

জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার বল তো? বড্ড যে ভাবুক ভাবুক লাগছে!

কিছু হয় নি, যাও। গৌরী চটে গেল যেন: তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

খাবার সাজিয়ে দিয়ে গৌরী কাঁটা চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ গো, কাঁটা চামচ দিয়ে খাবে?

যতীন এবার বেশ জোরেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ওরে বাপ রে, তোমার জামাইবাবু তো দো-দিনকা সুলতান বানিয়ে দিয়েছেন। তোমার শখ তাতেও মিটল না। এবার সাহেব বনতে হবে!

ওর কথার ধরনে গৌরীও হেসে ফেলল। যতীন বলল, তাহলে তুমিও কাঁটা চামচ ধর। এক সঙ্গেই সাহেব মেম বনে যাই।

চমকে উঠল গৌরী। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

ধ্যাৎ! আমি তাই বলেছি নাকি! সব তাতেই তোমার ঠাট্টা!

কাঁটা চামচ ঠক ঠক করে প্লেটের উপর গৌরী রেখে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বুকের ধুকপুকানি গেল না। কী পাগলামিই না মাঝে মাঝে চাপছে তার মাথায়! কী ছেলেমানুষি!

কেয়া শুয়ে ছিল। চট করে উঠে বসল। বলল, বাবা, তুমি মেম ছাহেব?

যতীন হেসে বলল, না মা, আমার কি মেমসাহেব হবার ভাগ্যি! মেম সাহেব হচ্ছেন তোমার মা।

কল্যাণও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ল: আর আমি?

যতীন বলল, তুমি হলে মেম সাহেবের ছা।

গৌরীও হেসে ফেলল ছেলেমানুষের মত: এই, কী হচ্ছে?

কেয়া থপ-থপ করে এগিয়ে এল যতীনের কাছে। কোল ঘেঁষে।

আল আমি? বাবা, আমি?

তুমিও মা, মেম সাহেবের শাশুড়ী।

কথাটা কেয়ার পছন্দ নয়। না, আমি মেম না। আমি ঝি।

যতীন বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি ঝি।

যতীন বলল, যাই বল, বেশ কাটল কিন্তু কদিন। তোমার জামাই-বাবু লোকটি সত্যিই ভাল কিন্তু। ওখানে যাবার আগে, বড়লোক ভেবে আমার মনে কিন্তু দ্বিধা ছিল। বেশ লেগেছে আমার।

জামাইবাবুর প্রশংসা শুনে গৌরী খুশীই হল। যতীন এমনিতে চাপা। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানটি টনটনে।

যতীনের প্লেটে আরও কিছু মাংস চাপিয়ে গৌরী বলল, তা সত্যি। মেলামেশা তো নেই-ই বলতে গেলে। সেই কবে দেখেছি! ভয় তাই আমারও ছিল।

একটু থেমে আবার বলল, তোমারও খুব প্রশংসা করছিলেন জামাইবাবু।

যতীন বলল, সেটা বোধ হয় ফিস্ হিসেবে।

গৌরী বুঝতে পারল না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে রইল তাই।

যতীন বলল, ব্যবসাদার লোক তো। শ্যালিকাটিকে যে-আন্দাজ প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হয়তো মনে পড়ল, শ্যালিকার স্বামীটি হয়তো ঈর্ষান্বিত হতে পারে, তাই ফিস্ দিয়ে তার মুখটি বন্ধ করে দিলেন।

গৌরীর মুখ ঝপ করে লাল হয়ে উঠল ঃ ও মা, তুমি তাই ভেবেছ, আচ্ছা তুমি···আমি বলি···সব কথা তালগোল পাকিয়ে গেল গৌরীর। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। সামলে নিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার! মুখে কিছু আটকায় না!

বলতে বলতে হেসে ফেলল। যতীনের মুখে হঠাৎ সাধু ভাষায় 'ঈর্ষান্বিত' কথাটা শুনে তখন চটেছিল, এখন আবার সেই কথাটাই তার মুখে হাসি ধরিয়ে দিল।

বলল, ঈর্ষান্বিত হবার আর লোক জুটল না! আবার বলে ঈর্ষান্বিত! হি-হি-হি।

পরের স্টপেই বাসনপত্র গুছিয়ে নামিয়ে নিলে বয়গুলো। বিলের পয়সা নিল। যতীন ওদের বকশিশও দিল। ওরা সেলাম জানিয়ে চলে যাবার আগে কোন্ স্টেশনে বিকেলের চা আর কোন্ স্টেশনে রাত্রের খাবার দেবে তাও বলে গেল।

গৌরী বেশ লক্ষ্য করে দেখল ওদের। কালো চেহারায় ধপধপে সাদা উর্দি পরেছে। মাথায় সাদা পাগড়ি। কোমরে সবুজ রঙের বেল্ট। বেল্টের উপর আর পাগড়িতে ঝকঝকে তকমা।

গৌরীর এখন শুধু মনে হচ্ছে, সে যেন এমনি করেই এতটা জীবন কাটিয়ে এসেছে। এমনি নিশ্চিন্ত আরামে। এমনি দিন-জাগানো প্রকাণ্ড রোদের নির্ভয় আশ্রয়ে।

এমনও তার মনে হতে লাগল, আবার যখন সে এসে বসল জানলার ধারে মাঠের দিকে চেয়ে, সে কখনও থাকেই নি জেলেপাড়ার কানা-গলির এক অন্ধকূপে। সকাল-সন্ধ্যেয় কয়লার ধোঁয়ায় কখনও আচ্ছন্ন হয় নি তার চোখ। কয়লা ভেঙে আর বাসন মেজে (মাঝে মাঝে ঠিকা ঝিটা কামাই করলে) তার হাতে ফোস্কা পড়ে নি কখনও। মাসের শেষে সংসার চলবে কী করে তা ভেবে রাত্রের ঘুম পাতলা হয়ে যায় নি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মন-কষাকষি হয় নি প্রতিবেশীর সঙ্গে।

সে যেন এইভাবে চলে এসেছে চিরকাল। বয় এসে খাবার দিয়ে গেছে সময়মত। প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের কামরায় গদি-মোড়া বেঞ্চে বসে চলমান পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে বেড়িয়েছে শুধু। কোন ছোট আড়াল তার চোখকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। কোন তুচ্ছ পাঁচিল তার মনকে আটকে রাখতে পারে নি।

গৌরীর হঠাৎ মনে পড়ল, তাই তো, কারও সম্পর্কে সে তো মন্দ কিছু ভাবে নি, কারও অমঙ্গল চিন্তা করে নি এ কয়দিন। যেই সে কথা মনে পড়ল, আর গৌরীর গোটা অস্তিত্বকে কে যেন তুলে নিয়ে চলল উপরে—উপরে আরও উপরে। সুখানুভূতিময় অপূর্ব আনন্দের এক স্বর্গে। গৌরীর কেমন যেন কাঁদতে ইচ্ছে করল। হারিয়ে-যাওয়া শিশু মার কোলে ফিরে এলে পাওয়ার আনন্দে যেমন কাঁদে, তেমন

কান্না তার পরিশুদ্ধ মনোলোকের গভীর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল।

জানলার ধারিতে মাথা রেখে এক সময় সুখের ঘুমে তলিয়ে গেল গৌরী।

ঠেলা খেয়ে জেগে দেখে যতীন ডাকছে। স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। বয় এসে চায়ের ট্রে রাখছে। আর কল্যাণ কেয়া একটি বয়ের হাত ধরে ঝুলছে আর বলছে, তুমি কাবলিওয়ালা, তুমি কাবলিওয়ালা।

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

বাথরুমে ঢুকে মুখে চোখে জল দিতে দিতে টের পেল সে, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর অমনি কামরার ভিতর হুটোপাটি, চিৎকার, যতীনের ধমক, শুনে চমকে বেরিয়ে পড়ল।

দেখে, কমবয়সী একটা দেহাতি ছেলে আর মেয়ে উঠে পড়েছে তাদের কামরায়। ছেলেটা দরজা ধরে অবোধ্য ভাষায় প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটা জড়সড় হয় দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। তার সারা মুখে লজ্জা লেপা। পোশাক-টোশাক দেখে গৌরীর মনে হল নতুন বর কনে।

ওদের দেখে কল্যাণ কেয়ার ভারি ফুর্তি। যতীন হয়তো কিছুটা বিরক্ত। ছেলেটাকে লক্ষ্য করে সমানে বলে চলেছে, বন্ধ কর দরজা। এই ছোকরা! বন্ধ কর। পড়ে গেলে মর জায়েগা।

কিন্তু ছেলেটার কোনদিকে লক্ষ্য নেই। গাড়িটা যতক্ষণ না প্ল্যাট-ফর্ম ছাড়িয়ে গেল, ততক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচিয়ে গেল। ভাবনায়, বোধ হল, ছেলেটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। মেয়েটাকে দেখে গৌরীর মনে হল, ও যেন একটু মজাই পেয়েছে।

গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে গেলে ছেলেটা দরজা এঁটে দিয়ে মেয়েটির কাছে সরে এল। তারপর দুজনে ফিসফিস করে কী যেন বলল। একটু পরেই দেখা গেল দুজনে একটু ধাতস্থ হয়েছে। মেঝেয় জড়সড় হয়ে বসেও পড়ল ওরা।

যতীন ডাক দিল তাকে, এস গো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গৌরী

রুটিতে মাখন মাখিয়ে কল্যাণ কেয়াকে খেতে দিল। দিল যতীনকেও।

কল্যাণ রুটি কামড়াতে কামড়াতে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, ওদের বুঝি বিয়ে হয়েছে?

যতীনের বিরক্তির ভাবটা, গৌরী দেখল, কেটে যাচ্ছে।

বলল, তাই তো মনে হচ্ছে বাবা।

মঞ্জুদির মত বিয়ে?

হবে হয়তো।

নেমন্ত' খেয়েছে ওরা?

তা তো বলতে পারব না। সে বরং তুমি ওদের জিজ্ঞেস কর।

কল্যাণ সটান গিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল। তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, এই মেয়ে, তোমার বিয়ে হয়েছে, মঞ্জুদির মতন? নেমন্ত' খেয়েছ?

দেখাদেখি কেয়াও গেল। ছেলেটার পিঠে চড়ে বলল, আমি ঝি।

ছেলেটা আর মেয়েটা ওদের পেয়ে খুব খুশী। চারজনে জমে গেল খুব। কল্যাণ মঞ্জুদির বিয়ের বর্ণনা দিতে লাগল। কেমন বাজনা হল। মঞ্জুদির বরটা খুব পাজি। মঞ্জুদিকে নিয়ে পাতালে চলে গেছে। কল্যাণ একটু বড় হলে তীর ধনুক বানিয়ে পাতালে যাবে। তারপর এক বাণ মেরে মঞ্জুদির বরটাকে মেরে ফেলে মঞ্জুদিকে উদ্ধার করবে। ছেলেটাকেও সঙ্গে নেবে তখন। ওরা অবাক বিস্ময়ে কল্যাণের কথা শোনে, নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে আর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যতীন চা খেতে খেতে বলল, ছেলেটা একটু বোকা মনে হয়। মেয়েটা কিন্তু বেশ চতুর।

দেখে গৌরীরও তাই মনে হল। সে হাসল।

পরের স্টপে গাড়ি থামতেই ওরা দুজনে হুড়মুড় করে নেমে গেল।

বেলাও পড়ে আসছে। গৌরীর কেমন খারাপ লাগতে শুরু করল। কলকাতার বাংলা কাগজ পাওয়া গেল দেখে একখানা কিনল যতীন।

গৌরী কাগজখানা হাতে নিয়ে উল্টাতে লাগল।

"উদ্বাস্তুদের আর পশ্চিমবঙ্গে লওয়া হইবে না।" "আমেরিকা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে চন্দ্রে রকেট পাঠাইবে।" "নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জে অচল অবস্থা।" "ভারত বিদেশী সাহায্য না পাইলেও পরিকল্পনার কার্য আগাইয়া লইতে পারিবে।" যত বাজে খবর। রোজ রোজ এক কথা। গৌরীর কাছে কোনও খবরটা পড়ার যোগ্য বলে মনে হল না।

হঠাৎ একটা খবর পড়ে তার গা ছমছম করে উঠল। "জনৈক দুর্বৃত্ত কর্তৃক চলন্ত ট্রেন হইতে মহিলা যাত্রীর অলঙ্কার অপহরণ। দুর্বৃত্তের সহিত ধস্তাধস্তির সময় ছুরিকাঘাতে মহিলা গুরুতররূপে আহত।"

মনে মনে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গৌরী। তার মনে পড়ল, তার সঙ্গে গয়না আছে অনেক টাকার। সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

কাগজটা নিয়ে যতীনের কাছে গেল গৌরী। জিজ্ঞাসা করল শঙ্কিত গলায়, এই খবরটা দেখেছ ?

যতীন পুরো মন দিয়েছে পড়ায়। মুখ না তুলেই বলল, কোন্ খবরটা ?

কাল নাকি সোদপুরের কাছে চলন্ত ট্রেনে এক হেডমিস্ট্রেসকে জখম করে তার গয়না কেড়ে নিয়েছে !

ও, বলে যতীন আবার পড়ায় মন দিল।

যতীন খবরটা গ্রাহ্যই করল না। যদি হেডমিস্ট্রেসকে খুন করে রেখে যেত ?

আবার বলল গৌরী, ভাগ্যিস প্রাণে মারে নি।

যতীন নিরুত্তর।

মারতেও তো পারত ?

এবার অবিশ্যি যতীন জবাব দিল, পারত বইকি। তবে এবারও সে মুখ তুলল না বই থেকে।

বল কী ! শিউরে উঠল গৌরী : ট্রেনের মধ্যে মেরে ফেলবে মানুষকে ?

তা কখনও-সখনও ট্রেনের মধ্যেও মারে।

মারে ! সর্বনাশ !

যে সংশয় ভয় খোঁয়াড়ে ভরে রেখেছিল গৌরী সারাদিন, ঘেঁষতে দেয় নি মনের ধারে কাছে, এবার তারা পিল পিল করে এগিয়ে আসতে লাগল। বাইরে তখন শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। ট্রেনের কামরায় বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে।

উৎসাহ উদ্দীপনা প্রাণের তেজ যা কিছু তার ছিল সব খুইয়ে বসেছে গৌরী।

রাত বেড়েছে। খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে দিয়েছে আগের স্টপে। দু দিকে জানলার ধারে দুটো বিছানা পেতেছে। এক দিকে যতীন, আর-এক দিকে গৌরী। ওদের মাঝখানে মাথার দিকে যে আড়াআড়ি বেঞ্চি তাতে শুইয়ে দিয়েছে কল্যাণ আর কেয়াকে। পায়ের দিকে বেঞ্চিটা, দুটো দরজার মাঝে, খালি। জানলা সব বন্ধ করেছে গৌরী। কল্যাণ কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। চাদর দিয়ে তাদের ঢেকে দিয়েছে বেশ করে। যতক্ষণ পেরেছে কাজ করেছে। থামলেই মুশকিল। শিনশিনে একটা ভয় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে গৌরীকে।

একটু ভরসা, আলোটা এখনও পর্যন্ত জ্বালা আছে। তবে যতীনের ঘুম পেলে সেটাও নিবে যাবে। আলো থাকলে ঘুমতে পারে না যতীন।

গৌরীও পারে না। কিন্তু নাই বা ঘুমাল ওরা একটা রাত। কথা বলুক না যতীন। দুটো গল্প করুক না ওর সঙ্গে।

কী গল্প করবে ? তাই তো, কী গল্প করবে ! গৌরীর মনে পড়ল বিয়ের পর কী বকবকই না করত দুজনে ! রাতের পর রাত কেমন হুস করে পার হয়ে যেত। কোন খেই থাকত না, কিছু মানেও খুঁজে পাওয়া যেত না সে সব কথার। শুধু বলার আনন্দে বলত। তারপর ধীরে ধীরে সে স্রোতে ভাঁটা পড়ে এল কেমন করে ! এল

কাজের কথা বলবার যুগ। হ্যাঁ, যুগই বটে। ইতিহাসেরই শুধু যুগ পরিবর্তন হয় না, মানুষের জীবনেরও হয়। গৌরীর জীবনেও হয়েছে।

এমন এক যুগ গেছে যখন যতীন আর গৌরী শুধু কাজের কথা, দরকারী কথা ছাড়া আর-কিছু বলারই পায় নি। তারপরের যুগে, অর্থাৎ এখন, তো তাও কমেছে। সংসারে কী দরকার না-দরকার তা জানা হয়ে গেছে দুজনেরই। এখন অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে আর প্রায় কথাই হয় না দুজনের।

বহুদিন পরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল ওরা জামাইবাবুর চিঠি আর টাকা পেলে। যাওয়া হবে কি হবে না, জামাইবাবুর টাকায় যাওয়া হবে, না, তা ফেরত দেওয়া হবে, কদিনের ছুটি নেওয়া উচিত যতীনের, কোন্ ক্লাসে যাওয়া উচিত, জামা কাপড় কী কেনা হবে, বিছানাপত্র নেওয়া হবে কি না ইত্যাদি বহুতর আনকোরা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তার সমাধান নিয়ে বহু আলোচনা কয়েক-দিন ধরে তাদের মধ্যে হয়েছিল।

বর্তে গিয়েছিল গৌরী। এখন আবার যে-কে সেই।

যতীন আবার চুপ করে গেছে। সত্যি কী এমন কথা আছে, যাকে অবলম্বন করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়?

তার চেয়ে যতীন বরং ঘুমিয়েই পড়ুক।

ভাবতে-না-ভাবতেই যতীন উঠে বসল। হাই তুলল দুবার। খুট করে আলো নেবাল। শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকারের একটা জমাট ভারী পাত গৌরীকে যেন ঠেসে ধরল বিছানায়। চোখ বুজল গৌরী। সেখানেও অতল অন্ধকার। তার চেয়ে চোখ খুলে থাকলেই ভাল। এত অন্ধকারে থাকতে পারছে না সে। গৌরীর মনে হল, অতলস্পর্শী এক অন্ধকূপের গভীরে পড়ে যাচ্ছে পা পিছলে। যেন দম আটকে মরে যাবে।

তাই এক ঝাঁকে উঠে পায়ের দিকের একটা জানলা খুলে দিল। অন্ধকার একটু পাতলা হল সেখানে। এক ঝলক বাতাস ঢুকে তাকে একটু স্বস্তি দিল।

তারপর ভাবনা আর তন্দ্রা মিলিতভাবে তাকে এক আধো-ঘুম আধো-জাগরণের রাজ্যে নিয়ে ফেলল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হতেই গৌরী দেখল, যতীনের দিকেব দরজাটা খুলে গেল। হুড়হুড় করে অনেকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল কামরায়। আর প্রায় তারই সঙ্গে একটা লোক। বিরাট চেহারা।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল গৌরী। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, গলার স্বর বেরুল না। দৌড়ে গিয়ে যতীনকে উঠিয়ে দিতে চাইল। পারল না।

লোকটা দরজা ধরে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল জমাট রাত্রির বুক চিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটেছে। তার গন্তব্য বুঝি গৌরীর সর্বনাশে।

গৌরীর সারা অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে ভয়ে। ঠিক আছে চোখ দুটো। আব চেতনা।

লোকটির চেহারা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছে গৌরী। বুঝতে পারছে না ওর মতলব। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওখানে তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়! ধীরে ধারে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে আসবে। তারপর এক এক করে শেষ করবে ওদের।

আগে যতীনকে। ওর শক্ত হাত দুটো দিয়ে যতীনের টুঁটি টিপে ধরবে। দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে। টুঁ শব্দটি করতে পারবে না সে। বেরিয়ে আসবে জিভটা, ঠেলে উঠবে চোখ। ওঃ! চোখ বুজে ফেলল গৌরী। ওর নাভিকুণ্ড থেকে ভয়াবহ এক শীতল স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে গলার ভিতর দিয়ে। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন জমে গেছে তার স্পর্শে।

যতীন গেছে। এবার কার পালা? গৌরীর মনে হল, লোকটা এবার কল্যাণ কেয়ার দিকে চাইছে। ওগো, না না না। ওদের ছেড়ে দাও, দয়া কর, ওদের ছেড়ে দাও। এই নাও, আমার যা আছে সব নাও।

লোকটা এতক্ষণ ওকে দেখতে পায় নি। ওর চিৎকারে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা মোটা আঙুল গৌরীর ঠোঁটে চেপে ধরে বলছে, চুপ। সে চুপ করে গেল। লোকটা ইশারা করল, যা আছে দাও। গৌরী যেন সম্মোহিত। সব বের করে দিল। নিজের গায়ে যা ছিল, খুলে দিল।

তাতেও হল না, খুশী হল না লোকটা, ইশারা করতে লাগল, আরও দাও। আর কী দেবে গৌরী? আর কানাকড়ি সম্পদও তো নেই তার।

আরও কী চায় লোকটা? কী, তাকে চায়! হা ঈশ্বর! না না, তোমার পায়ে পড়ি, আমার সর্বনাশ আর তুমি কোর না।

লোকটা ইশারা করল, হয় তুমি, না হয় ওই বাচ্চা ছুটো।

না না, তার চেয়ে মেরে ফেল। আমাদের একসঙ্গে মেরে ফেল।

লোকটা গৌরীকে ভাবতে সময় দিয়ে বসল পায়ের দিকের বেঞ্চিটায়। সিগারেট ধরাল একটা। অন্ধকারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

রাক্ষস। পিশাচ। ধৈর্য ধরে বসে আছে, কতক্ষণে গৌরীর তেজ ভাঙে, কতক্ষণে সে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেয়!

গৌরীর দেহটাকে টুকরো টুকরো করবে শকুনটা। সেই সুন্দর দেহটা। দিদির বাড়ির বাথরুমের নির্জন আয়নায় জীবনে সে প্রথম তার নিরাবরণ রূপটা দেখেছিল। তা ফুটে উঠল তার চোখে। মুগ্ধ হবার মত রূপই তার। গৌরীকে যে দেখেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। জামাইবাবুও মুগ্ধ হয়ে গেছেন এই বুড়ো বয়সেও। গৌরী তা জানে। যতীন 'ঈর্ষান্বিত' কথাটা বোধ হয় একেবারে বানিয়ে বলে নি।

এখন এসেছে এই দস্যুটা। অমন সুষমা তচনচ করে দেবে। ওই যে বসে বসে সিগারেট টানছে। অপেক্ষা করে আছে গৌরীর স্বেচ্ছাসম্মতির।

না, অপেক্ষা বোধ হয় আর করল না। নিজেই উঠে পড়েছে। হ্যাঁ, আসছে গৌরীর পায়ের দিকে। গৌরীর দেহের সমস্ত কটা স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে গেল উত্তেজনায়।

দরজা খুলল লোকটা। পালাবার পথটা করে রাখল। ট্রেনের গতি কি কমে আসছে? চাকায় রেলে কি দোল খাচ্ছে? এ কী, স্টেশন এল না কি? গাড়ি কেন থামল?

দরজা সম্পূর্ণ খুলে নামতে গিয়েও লোকটি থমকে দাঁড়াল। তার পর জোর গলায় হাঁক দিলে, বাবুজী! বাবুজী!

যতীন ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

লোকটি বলে গেল, এধারকার রাস্তা খারাপ। এখনও সামান্য রাত বাকী আছে। বাবুজী যেন দরজা ভেতর থেকে লক করে দেন।

যতীন ঘুম চোখে উঠে এসে লোকটিকে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

গৌরী যেন মরে গেছে। অবসাদে শিথিল হয়ে তেমনিভাবে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল লোকটি নেমে গেছে। দেখল, যতীন বেঁচেই আছে।

স্বস্তির নিশ্বাসটা ভারী হয়ে পড়ল। যেন সব ভয়, সব আতঙ্ক বের করে দিয়ে বুকটাকে হাল্কা করে দিল।

মনে হল, একটু পরিষ্কার বাতাস টানতে পারলে বাঁচত। যেই মনে হওয়া অমনি উঠে মাথার কাছের জানলাটা খুলে দিল।

দেখল, আলোয় আলোয় স্টেশনটা ছেয়ে গেছে। আর তাদের কামরার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা, ওদের গাড়ি থেকে যে এইমাত্র নেমে গেল।

গৌরী দেখল, লোকটার বেশ বয়েস হয়েছে। সুন্দর সৌম্য চেহারা। লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে পনর-ষোল বছরের অবাঙালী একটা মেয়ে ঝুলছে আর পিতাজী পিতাজী করে আনন্দে চেঁচাচ্ছে। লোকটি আদর করে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে। তার সারা মুখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

দৃশ্যটা যেন সপাৎ করে চাবুক মারল গৌরীকে।

শেষ রাত্রের সেই ভারী ভিজে অন্ধকার পরিবেশ, আলোকিত

স্টেশন আর সব ছাপিয়ে বাপ-বেটীর সেই স্নেহক্ষরা পুনর্মিলন গৌরীর চেতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

লোকটা আদৌ দুর্বৃত্ত নয়, বদমাশ নয়। সে যতীনকে গলা টিপে হত্যা করে নি। ওই তো যতীন ঘুম-চোখে দরজা বন্ধ করে গেল, গিয়ে আবার ঘুমচ্ছে। কল্যাণ-কেয়ারও অমঙ্গল কিছু ঘটে নি। গৌরী যেন জমা-খরচের খাতায় নিস্পৃহ খাজাঞ্চীর মত হিসেব তুলে রাখছে। না, কল্যাণ কেয়ার একগাছি চুলও নষ্ট হয় নি। ক্ষতি হয় নি গৌরীর। যদিও ট্রাঙ্কের দিকে সে চাইল না, তবু সে নিশ্চিন্তভাবে বুঝল, গহনার কেসটা তার মধ্যে অটুটই রয়েছে।

সব ঠিক আছে। তবে ?

তবে ওই লোকটিকে দেখে গৌরী অত ভয় পেল কেন ? অত যন্ত্রণা বোধ করল কেন ?

ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধীরে স্টেশনটা সরে যেতে লাগল গৌরীর অবসন্ন চোখের উপর দিয়ে।

ওই যে ওরা। গৌরীর চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গেটের সামনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে বাবা আর মেয়ে। মেয়ে বাবার হাত থেকে টিকিটটা কেড়ে নিয়ে কালেক্টারকে দিল, তারপর হাসতে হাসতে দুজনেই বেরিয়ে গেল। আর দেখা গেল না ওদের। ট্রেনখানা ততক্ষণে গৌরীকে নিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে।

কেন এত ভয় পেল গৌরী ? লোকটার স্নেহময় মুখে তো তার বাবার ছবিই দেখতে পেল। দেখল যতীনের। কল্যাণ কেয়াকে যতীন যখন আদর করে তখন তার মুখেও তো ওই একই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে।

এই গাড়িতে উঠেছিল কেন ? কেন উঠবে না। গাড়ি তো তাদের রিজার্ভ করা ছিল না। আলো কেন জ্বালল না তবে ? ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চায় নি, তাই।

এমনই খুঁটিয়ে বিচার করতে বসল গৌরী। লোকটি যে দুর্বৃত্ত নয়, সে সম্পর্কে একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করতে লাগল।

লোকটির প্রত্যেকটি আচরণ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করল, লোকটি সত্যিই ভদ্রলোক ছিল। অনর্থক ভয় পেয়েছে গৌরী।

যে মুহূর্তে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, সেই মুহূর্তেই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন কামড় মারল তার আত্মার মর্মমূলে। গৌরী নতুন এক তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, লোকটি যে ভাল সে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গৌরীকে অনেক প্রমাণেব সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে তাকে দুর্বৃত্ত বলে ধরে নিয়েছিল। তখন তো কোনও প্রমাণের জন্য সে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করে নি।

ছি ছি ছি! গৌরী কী, গৌরী কী? ট্রেনখানা যেন চাকায় চাকায় মৃদু ধিক্কার তুলতে লাগল।

গৌবীর মনে পড়ল মানুষ এককালে গুহাবাসী ছিল। দেহে মনে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। শুধু ভয়, শুধু সংশয় আর আতঙ্ক, এই ছিল সে-:ব মানুষেব প্রধানতম অনুভূতি। দৈবাৎ কাউকে দেখত যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করত তাকে।

তারপব সে যুগকে অনেক পিছনে ফেলে গৌরীবা চলে এসেছে আজকের জগতে, অনেক আলোয় স্নান করে অনেক সূর্যের প্রসাদ পেয়ে।

কিন্তু কই, সেই আদিম অন্ধকূপকে গৌরী তো আলোকিত করতে পারে নি। সে যে এখনও তার মধ্যে বাস করছে। কী তফাত তাতে আর তার স্যাঁতসেতে কলকাতার বাসাটাতে?

সেই লোকটি তাদের কামরায় ওঠার পর গৌরী আর তাব মাঝে একটা বিশ্বাস, মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস, জন্ম নিচ্ছিল। কোথায় তাকে লালন করবে গৌরী, না তাকে খুন করে বসল! হ্যাঁ হ্যাঁ, খুন কবেছে।

কল্পনায় যতীনের খুন যখন দেখেছে গৌরী তখনই খুন করেছে নিষ্পাপ শিশুর মত নবজাত সেই বিশ্বাসকে। তেমনি করে গলা টিপে টিপে।

পূবের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। তখনও রোদ ওঠে নি। গৌরী হাত দুটো তুলে ধরল সেই আবছা আলো-ছায়ায়। কী বীভৎস দেখাতে লাগল সে দুটো! যেন মৃত কোনও মানুষের হাত।

এক অসহ্য যন্ত্রণায় গৌরীর মর্মস্থল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

নিজের মনের দিকে চাইল গৌরী। কী গভীর খাদ, আর কত জমাট অন্ধকার! ভয় আর সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক, এই দিয়ে ঠাসা।

গৌরীর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আলো—আলো না হলে বাঁচবে না গৌরী।

সবশেষে পূর্ব-দিগন্তের সীমানায় যে রক্তিম আলোর সঙ্কেত দেখতে পেল সে, তারই উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল ঃ

হে জবাকুসুমকান্তি, আমার অন্ধকার দূর কর, পাপ ক্ষমা কর। আমাকে শুচি কর। আর একবার আমায় সুযোগ দাও, বিশ্বাসকে লালন করবার। অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যাও।